বাংলাদেশের কৃষিঃ
পত্তনি চাষ ও চুক্তিবদ্ধ চাষের
রাজনৈতিক অর্থনীতি

আবুল বারকাত
গাজী মোহাম্মদ সোহ্‌রাওয়ার্দী

মুক্তবুদ্ধি
প্রকাশনা

একটি মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা

"বাংলাদেশের কৃষি: পত্তনি চাষ ও চুক্তিবদ্ধ চাষের রাজনৈতিক অর্থনীতি"

(Present Form and Disempowerment Process of the Rural Peasants: Fixed Rent Leasing and Contract Farming)

প্রথম প্রকাশ: মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা এপ্রিল ২০১৯

স্বত্ব ২০১৯ © আবুল বারকাত ও গাজী মোহাম্মদ সোহ্‌রাওয়ার্দী

মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনার নবম গ্রন্থ

বাংলাদেশে আবুল বারকাত কর্তৃক প্রথম প্রকাশিত

প্রকাশক
মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনার পক্ষে
আবুল বারকাত
বাড়ী নং ৫, রোড নং ৮, মোহাম্মদীয়া হাউজিং সোসাইটি
মোহাম্মদপুর, ঢাকা ১২০৭, বাংলাদেশ
ফোন নং: ৫৮১৫০৩৮১, ০১৭৫৬১৪২৩১৫;
ওয়েব সাইট: www.muktobuddhi.com

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা ও অলংকরণ: ....

মুদ্রণ ও বাঁধাই: আগামী প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং কোং
২৭ বাবুপুরা রোড
নীলক্ষেত, ঢাকা।

লেখকদ্বয় কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
এই গ্রন্থের কোনো অংশ লেখক-স্বত্বাধিকারী-প্রকাশকের লিখিত পূর্বানুমতি ছাড়া পুনর্মুদ্রণ বা অন্য কোনো মাধ্যমে রূপান্তর করা যাবে না। আলোকচিত্র, ফটোকপি, রেকর্ডিং এই আইনি নিষেধাজ্ঞার আওতাভুক্ত।

ISBN: 978-984-34-6629-7

মূল্য: ২০০ টাকা, ইউএস ২০ ডলার, ইউকে ১২ পাউন্ড, ইউরোপ ১৬ ইউরো

উদ্ধৃতি সুপারিশ: আবুল বারকাত ও গাজী মোহাম্মদ সোহ্‌রাওয়ার্দী (২০১৯), **বাংলাদেশের কৃষি: পত্তনি চাষ ও চুক্তিবদ্ধ চাষের রাজনৈতিক অর্থনীতি**। ঢাকা: মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা।

মুখবন্ধ

এদেশের গ্রামবাংলার খেটে খাওয়া কৃষক, বিশেষ করে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকেরা এখন আগের মত ভালো নেই। কেন নেই? কেন এমন হলো? এর কারণ তারা কৃষি উৎপাদনের ওপর, উৎপাদনের মূল উপায় (Means of Production) জমির ওপর নিয়ন্ত্রণ হারাচ্ছে। এটিই উত্তর-স্বাধীনতা যুগে কৃষি-সমাজ ও কৃষক জীবনের নিষ্ঠুর চালচিত্র, জলছবি। আমাদের কালের গুরুত্বপূর্ণ কৃষি প্রশ্ন।

এই গ্রন্থে আবুল বারকাত ও গাজী মোহাম্মদ সোহ্‌রাওয়ার্দী এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছেন, একেবারে তৃণমূলে গিয়ে। তাঁদের অনুসন্ধানের মাধ্যমে অনেক প্রয়োজনীয়, নতুন তথ্য বেরিয়ে এসেছে। আমরা জেনেছি, প্রায় সাড়ে ১৬ লক্ষ পত্তনি চাষি খানা এবং প্রায় ১১ লক্ষ চুক্তিবদ্ধ চাষি খানা ইতোমধ্যেই জমির উর্বরতা হ্রাস, ঋণগ্রস্ততা ও আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। পত্তনি চাষের ফলে প্রায় ৩ লক্ষ ১০ হাজার একর কৃষি জমি এবং চুক্তিবদ্ধ চাষের ফলে প্রায় ১ লক্ষ ৬২ হাজার একর কৃষি জমি অনুর্বর হয়ে পড়েছে। তাদের গবেষণা আরো দেখিয়েছে, এই দুই চাষ প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত কৃষি খানাগুলোর খাদ্য নিরাপত্তা কিভাবে বাজার নির্ভর হয়ে পড়েছে, কিভাবে বিভিন্ন কৃষি কাজে নারীর অংশগ্রহণ ধীরে ধীরে সঙ্কুচিত হয়েছে, চাষে লোকসান দিয়ে ঋণগ্রস্ত দরিদ্র ও প্রান্তিক কৃষক কৃষি কাজ ছাড়ছে।

ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের অ-ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়া নিয়ে এই সময়োচিত গবেষণার পর্যবেক্ষণ 'মধ্য আয়ের দেশ'-এ পরিণত হওয়ার স্বপ্নে বিভোর আমাদের নীতিনির্ধারকদের জন্য এক বিরাট চ্যালেঞ্জ। এখনো এদেশের জনগোষ্ঠীর উল্লেখযোগ্য অংশ দরিদ্র ও হত-দরিদ্র। এদের বড় একটি অংশই গ্রামীণ কৃষি খানা অথবা এক বা দুই প্রজন্মের রূপান্তরিত অ-কৃষি খানা। বাণিজ্যিক কৃষির আশীর্বাদ থেকে এরা বঞ্চিত। বরং অনেক ক্ষেত্রেই কৃষির বাণিজ্যিকীকরণ তাদের প্রান্তিকতাকে, নিঃস্বতাকে তীব্র করেছে। পত্তনি ও চুক্তিবদ্ধ চাষের চর্চার ফলে এই প্রান্তিকতা ও নিঃস্বতা দিন দিন আরো দৃশ্যমান হয়েছে ।

দরিদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের এই অ-ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়ার কি আদৌ অবসান হবে, নাকি কৃষি ও জমির ওপর অধিকার, স্বাতন্ত্র্য ও নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে, কৃষি ছেড়ে, গ্রাম ছেড়ে সহায় সম্বলহীন অবস্থায় তাদের ঠাঁই মিলবে শহরের বস্তিতে, ফুটপাতে। এভাবেই কি আমূল বদলে যাবে তাদের চিরচেনা, অভ্যস্ত জীবনের ধারাপাত, পদাবলী? আমাদের গবেষকরা অবশ্য আশাবাদী। নিকট ভবিষ্যতে গণমুখী কৃষি বিপ্লবের অনুপস্থিতিতে তারা কৃষক-বান্ধব সংস্কারের ওপর আস্থা রেখেছেন। গ্রন্থের উপসংহারে তারা বলেছেন, "... সরকারের নীতি ও কর্মসূচীর লক্ষ্য হওয়া উচিত এ দুই (পত্তনি ও চুক্তিবদ্ধ) চাষ-চর্চার নেতিবাচক পরিণামের সর্বনিম্নকরণ ও ইতিবাচক পরিণামের সর্বোচ্চকরণের মাধ্যমে প্রান্তিক ও দরিদ্র কৃষকের চলমান অ-ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়ার পরিসমাপ্তি টানা"। তবে আগামী দিনের নীতি ও কর্মসূচীর সোনালী ফসলের কতটুকু দরিদ্র কৃষকের ঘরে উঠবে তার অনেকখানিই নির্ভর করছে তাদের সচেতনায়নের ওপর।

খুশী কবির
সমন্বয়কারী, নিজেরা করি

ঢাকা; ২৬ মার্চ, ২০১৯

কৃতজ্ঞতা

পত্তনি চাষ ও চুক্তিবদ্ধ চাষের ক্রমবর্ধমান চর্চায় ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের অস্তিত্ব থাকবে কি না – তাই আজকের দিনের অন্যতম জরুরি কৃষি প্রশ্ন। এই প্রশ্নের উত্তরের ব্যাপক নীতিগত উপযোগিতা বিবেচনায় নিয়ে, এদেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা 'নিজেরা করি' ২০১৭ সালে হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ সেন্টার (এইচডিআরসি)-কে "Present Form and Disempowerment Process of the Rural Peasants: A Case Study on Two Northern Upazilas" শীর্ষক গবেষণাকর্মটি সম্পাদনের দায়িত্ব অর্পণ করে। পরবর্তীকালে 'নিজেরা করি' গবেষণার ফলাফল ও সুপারিশ গ্রন্থাকারে বাংলা ভাষায় প্রকাশের দায়িত্বটি এইচডিআরসি-র প্রকাশনা সংস্থা মুক্তবুদ্ধিকে প্রদান করে। গবেষণা ও প্রকাশনার এই সময়োচিত উদ্যোগ গ্রহণের জন্য 'নিজেরা করি' এবং সংস্থাটির সমন্বয়কারী খুশী কবিরের প্রতি অজস্র ধন্যবাদ ও অশেষ কৃতজ্ঞতা।

গবেষণা এবং গ্রন্থ রচনার বিভিন্ন পর্যায়ে প্রয়োজনীয় সহায়তা দিয়েছেন 'নিজেরা করি'-র রেজানুর রহমান রোজ, তাকে বিশেষ ধন্যবাদ। পীরগঞ্জ ও সাঘাটায় 'নিজেরা করি'-র স্থানীয় কার্যালয়ের কর্মীবৃন্দ – বিশেষত জনাব মামুন উর রশিদ ও শ্রীযুক্ত গৌতম কুমার দে সরকার – যারা মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে আমাদের ব্যাপক সাহায্য করেছেন, তাদের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ।

এই প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত সবার দায়িত্ববোধ ও নিষ্ঠার ফলেই এই গবেষণা ও প্রকাশনা সুসম্পন্ন হয়েছে, এটি অনস্বীকার্য।

তথ্য সংগ্রহের গুরু দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিলো এক দল দক্ষ ও অভিজ্ঞ মাঠ-গবেষকের ওপর, যারা মাঠপর্যায়ের সব বাধাবিপত্তি পেরিয়ে সফলভাবে তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব সম্পন্ন করেন। নিখাদ আন্তরিকতার সাথে তারা কাজটি সম্পন্ন করেছেন, সে-জন্য তাদের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ।

আমরা ঋণী, ২০১৭ সালের ১৩ ও ১৪ নভেম্বরে পীরগঞ্জ (রংপুর) এবং সাঘাটায় (গাইবান্ধা) অনুষ্ঠিত কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী তৃণমূল পর্যায়ের উন্নয়ন কর্মী ও কৃষকদের কাছে তাদের মূল্যবান মতামতের জন্য, যা নিঃসন্দেহে এই গবেষণার মান বাড়িয়েছে। ২০১৮ সালের ২০ মার্চ 'মুক্তিযুদ্ধ যাদুঘর'-এ আয়োজিত জাতীয় সেমিনারে যারা অংশ নিয়েছেন, তাদের কাছেও আমরা বিশেষ ঋণী। তাদের সুচিন্তিত মতামত এই গবেষণা ও গ্রন্থের গ্রহণযোগ্যতা বাড়াবে এটি আমাদের প্রত্যাশা।

গবেষণা ও গ্রন্থ রচনার সব পর্যায়ে এইচডিআরসি-র নিজস্ব কর্মীবৃন্দ অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। আমরা তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ। গ্রন্থের পাণ্ডুলিপির শব্দ ও বাক্য বিন্যাস, বাংলা বানান ও এর ভাষা শৈলীর বিষয়টি দেখেছেন অধ্যাপক সুভাস কুমার সেনগুপ্ত; তার কাছে আমরা বিশেষভাবে ঋণী।

সর্বোপরি, আমরা চিরকৃতজ্ঞ মাঠপর্যায়ের তথ্যদাতাদের প্রতি, যাদের সহায়তা না পেলে এই গবেষণাকর্মটির বাস্তবায়ন সম্ভব হতো না।

গ্রামীণ কৃষকদের বর্তমান অবস্থা এবং অ-ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়া বোঝার জন্য এই গ্রন্থে উপস্থাপিত গবেষণা-বিশ্লেষণ কাজে এলে তবেই আমাদের প্রয়াস সার্থক হবে।

আবুল বারকাত
গাজী মোহাম্মদ সোহ্‌রাওয়ার্দী

ঢাকা; ৭ মার্চ, ২০১৯

সূচীপত্র

অধ্যায় ১: পত্তনি ও চুক্তিবদ্ধ চাষ: গবেষণা ও গ্রন্থ ৭

১.১ গবেষণার পটভূমি ৭
১.২ গবেষণার উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি ৯
১.২.১ গবেষণার উদ্দেশ্যাবলি ৯
১.২.২ গবেষণার পদ্ধতিগত বিষয় ৯
১.৩ গবেষণা থেকে গ্রন্থ ১০

অধ্যায় ২: পত্তনি চাষ ১১

২.১ ভূমিকা ১১
২.২ পত্তনি চাষে খানার অংশগ্রহণের মাত্রা ১১
২.৩ পত্তনি চাষের বিবর্তনের কারণসমূহ ১১
২.৪ পত্তনি চাষের ফলে কৃষির ওপর কৃষকের অধিকার, স্বাতন্ত্র্য এবং নিয়ন্ত্রণ হ্রাস ১৪
২.৫ পত্তনি চাষের ফলে জমির উর্বরতা হ্রাস ১৫
২.৬ পত্তনি চাষের ফলে অনুর্বর জমির বিক্রি ১৬
২.৭ পত্তনি চাষের ফলে কৃষকের কৃষি কাজ ত্যাগ ১৭
২.৮ পত্তনি চাষের ফলে বাজার নির্ভর খাদ্য নিরাপত্তা ১৭
২.৯ পত্তনি চাষের ফলে কৃষিতে নারীর কর্ম-সংকোচন ১৮

অধ্যায় ৩: চুক্তিবদ্ধ চাষ ১৯

৩.১ ভূমিকা ১৯
৩.২ চুক্তিবদ্ধ চাষে খানার অংশগ্রহণের মাত্রা ১৯
৩.৩ চুক্তিবদ্ধ চাষের বিবর্তনের কারণসমূহ ২১
৩.৪ চুক্তিবদ্ধ চাষের ফলে কৃষির ওপর কৃষকের অধিকার, স্বাতন্ত্র্য এবং নিয়ন্ত্রণ হ্রাস ২২
৩.৫ চুক্তিবদ্ধ চাষের ফলে জমির উর্বরতা হ্রাস ২৩
৩.৬ চুক্তিবদ্ধ চাষের ফলে অনুর্বর জমির বিক্রি ২৪
৩.৭ চুক্তিবদ্ধ চাষের ফলে কৃষকের কৃষি কাজ ত্যাগ ২৪
৩.৮ চুক্তিবদ্ধ চাষের ফলে বাজার নির্ভর খাদ্য নিরাপত্তা ২৪
৩.৯ চুক্তিবদ্ধ চাষের ফলে কৃষিতে নারীর কর্ম-সংকোচন ২৫

অধ্যায় ৪: সার-সংক্ষেপ, সুপারিশমালা ও উপসংহার ২৬

৪.১ সার-সংক্ষেপ ২৬
৪.২ সুপারিশমালা ২৬
৪.৩ উপসংহার ২৭

তত্ত্ব ও তথ্য উৎস ২৯
নির্ঘন্ট ৩১
গবেষণা দল ৩৪

সারণি তালিকা

সারণি ১: গবেষণায় সংগৃহীত সংখ্যাগত উপাত্ত ও গুণগত তথ্য ৯
সারণি ২: পত্তনি চাষের সাথে জড়িত সম্ভাব্য খানার সংখ্যা এবং খানার সদস্য সংখ্যা ১২
সারণি ৩: পত্তনি চাষের জন্য খানাগুলো যাদের কাছ থেকে জমি ইজারা নিয়েছে (%) ১৩
সারণি ৪: পত্তনি চাষের ক্ষেত্রে খানার সম্পদ নিয়োজনের পরিবর্তন (%) ১৪
সারণি ৫: পত্তনি চাষে খানার অংশগ্রহণের প্রধান কারণসমূহ [একাধিক উত্তর] (%) ১৫
সারণি ৬: পত্তনি চাষের ফলে অনুর্বর জমি ১৬
সারণি ৭: পত্তনি চাষের ফলে বিগত ১০ বছরে খানা প্রতি মোট আর্থিক ক্ষতি ও ঋণগ্রস্ততা (টাকা) ১৭
সারণি ৮: পত্তনি চাষের প্রক্রিয়ায় খানার নারীর অংশগ্রহণ [একাধিক উত্তর] ১৮
সারণি ৯: চুক্তিবদ্ধ চাষের সাথে জড়িত সম্ভাব্য খানা এবং খানার সদস্য সংখ্যা ২০
সারণি ১০: চুক্তিবদ্ধ চাষের জন্য খানাগুলো যাদের কাছ থেকে জমি ইজারা নিয়েছে (%) ২০
সারণি ১১: 'চুক্তিবদ্ধ চাষ'-এর ক্ষেত্রে খানার সম্পদ নিয়োজনের পরিবর্তন (%) ২১
সারণি ১২: খানাগুলোর চুক্তিবদ্ধ চাষে জড়িত থাকার পিছনে প্রধান কারণসমূহ [একাধিক উত্তর] (%) ২২
সারণি ১৩: চুক্তিবদ্ধ চাষের ফলে অনুর্বর জমি ২৩
সারণি ১৪: চুক্তিবদ্ধ চাষের ফলে খানা প্রতি মোট আর্থিক ক্ষতি ও ঋণগ্রস্ততা (টাকা) ২৪
সারণি ১৫: চুক্তিবদ্ধ চাষের প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ফসল উৎপাদনে খানার নারীদের অংশগ্রহণ [একাধিক উত্তর] ২৫

রেখাচিত্র এবং বক্সের তালিকা

রেখাচিত্র ১: উপাত্ত ও তথ্যের ট্রায়াংগুলেশন ১০
বক্স ১: দেশী সাগর কলা হারিয়ে যাচ্ছে! ১৬
বক্স ২: রাসায়নিক সার ক্রমেই ভূমির উর্বরতা বিনষ্ট করছে! ২৩

অধ্যায় ১

পত্তনি ও চুক্তিবদ্ধ চাষ: গবেষণা ও গ্রন্থ

১.১ গবেষণার পটভূমি

স্বাধীনতা পরবর্তী দুই দশকে, বিগত শতকের সত্তর এবং আশির দশকে, বাংলাদেশের প্রধান কৃষি প্রশ্ন ছিল এই দেশের কৃষি ধনতান্ত্রিক বা পুঁজিবাদী নাকি আধাসামন্ততান্ত্রিক (বারকাত, ২০১৯)। বিগত শতাব্দীর শেষাবধি এই বিতর্ক প্রাণবন্ত ছিল (ইউসুফ সম্পাদিত, ২০১১)। নতুন শতকের প্রথম দশকে এই প্রশ্নের 'এক ধরনের' মীমাংসা হয়। বর্তমানে প্রায় সব সমাজবিজ্ঞানীই এক মত যে, বাংলাদেশের কৃষি ধনতান্ত্রিক বা পুঁজিবাদী রূপ ধারণ করেছে[১]। যে সব লক্ষন তাদের এই উপসংহারে উপনীত হতে উদ্বুদ্ধ করে তার মধ্যে অগ্রগণ্য হচ্ছে কৃষিতে ক্রমবর্ধমান 'পত্তনি প্রথায় চাষ' (Fixed rent leasing) এবং 'চুক্তিবদ্ধ চাষ' (Contract farming)।

অনাদি কাল থেকেই বাংলাদেশে বর্গা চাষ বা ভাগ চাষ চলে আসছে; সেক্ষেত্রে কৃষকে[২]র উৎপাদিত ফসলের অর্ধেক পায় জমির মালিক। দেশের বিভিন্ন এলাকায় বর্গা চাষের পাশাপাশি পত্তনি প্রথারও (পূর্ব নির্ধারিত, নির্দিষ্ট পরিমাণ ফসল বা অর্থের বিনিময়ে কৃষককে জমি প্রদান) প্রচলন রয়েছে; এ প্রবণতা দিন দিন বাড়ছে। ভূমিহীন ও ভূমি-দরিদ্র খানাগুলো বর্গা চাষের মাধ্যমে জমিতে প্রবেশাধিকার পেতো, কিন্তু বর্তমানে ভূমি ব্যবহারের এই ব্যবস্থার ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে। বর্গা চাষ, এর শোষণমূলক বৈশিষ্ট্যের কারণে সবসময়ই বিতর্কিত ছিলো। বস্তুত, ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমলে বর্গা চাষের যে ধরনটি প্রচলিত ছিলো, তার বিরুদ্ধে বহু শক্তিশালী কৃষক বিদ্রোহের নজির ইতিহাসে মেলে (বারকাত, ২০১৬)। এই সব বিদ্রোহের ফলে বর্গা চাষ প্রক্রিয়ায় কিছু সংস্কারও হয়েছে।

সম্প্রতি কৃষকদের মধ্যে পত্তনি প্রথায় জমি লিজ দেয়া-নেয়া যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়েছে। ক্ষেত্রবিশেষে এই প্রথা কৃষককে অনেক বেশি 'স্বাধীনতা' দেয়। নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ পরিশোধের পর কৃষক তার 'ইচ্ছে মতো' লিজ নেয়া জমি চাষ করতে পারে এবং উচ্চ মাত্রার উৎপাদনশীলতা নিশ্চিত করার জন্য সর্বোচ্চ পরিমাণ প্রচেষ্টা চালাতে পারে। তবে এই চাষপদ্ধতি সমালোচনার উর্ধ্বে নয়। গ্রামাঞ্চলের আধিপত্যশীল সম্পত্তি সম্পর্ক ও ক্ষমতা কাঠামো পত্তনি চাষকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে। গরিব ও প্রান্তিক গ্রামীণ কৃষকরা প্রায়শই দর কষাকষি করে অধিকার বুঝে নেবার ক্ষেত্রে, নিজেদেরকে একটি দুর্বল অবস্থানে দেখতে পায়।

আশির দশক থেকেই দিন দিন বাংলাদেশের কৃষিতে 'মুনাফা-সর্বোচ্চকারী' দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানগুলোর অংশগ্রহণ বাড়ছে। চুক্তিবদ্ধ চাষ তাদের এই ব্যাপক অংশগ্রহণের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশ। বিশ্বায়নের এই যুগে, কৃষি উৎপাদনের বর্তমান রূপ যথেষ্ট বাণিজ্যিক। এটা চরিত্রগতভাবে চুক্তিভিত্তিক এবং কৃষি-ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। গরিব কৃষকদের জমি ও জীবিকা এই নিয়মের কোনো ব্যতিক্রম নয়। চুক্তিবদ্ধ চাষ, এই প্রেক্ষিতে, গ্রামীণ কৃষক শ্রেণির প্রান্তিকায়ণে একটি কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করছে। কৃষিকাজের এই বিশেষ পদ্ধতির আওতাধীন কৃষকরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সামান্য ক্ষমতারই অধিকারী, কারণ এই বিশেষ চাষ পদ্ধতির ক্ষেত্রে কোনো কৃষক-হিতৈষী আইন বা নীতি প্রায় নেই বললেই চলে। কী উৎপাদন করতে হবে, কীভাবে উৎপাদন করতে হবে, এবং কেন উৎপাদন করতে হবে – তা তারা খুব কম সময়ই নির্ধারণ করতে পারেন ('স্বাধীনতা', 'ইচ্ছে মতো চাষ'!)। এই 'কী-কীভাবে-কেন', আরো অনেক প্রশ্নের মধ্যে, একুশ শতকে এই দেশের জরুরি কৃষি প্রশ্নে পরিণত হয়েছে।

কৃষি উৎপাদনের কর্পোরেট রূপের ক্রমবর্ধমান প্রকাশনায় জমি লিজ নেয়া-দেয়া একটা নতুন বাস্তবতা। কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানগুলো এখন বর্গা বাজারের মাধ্যমে কৃষিতে বিনিয়োগ করছে এবং চুক্তিবদ্ধ চাষের আওতায় প্রচলিত কৃষি খানা-খামারগুলোকে সম্পৃক্ত করছে। কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানগুলো শস্য বাছাই করা, উপকরণ সরবরাহ নিশ্চিত করা এবং পূর্বনির্ধারিত মূল্যে পণ্য কেনাসহ উৎপাদন প্রক্রিয়ার সব ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে। এই ব্যবস্থার অধীনে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের উৎপাদন প্রক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো সম্পর্কে বিশেষ কিছুই বলার থাকে না।

---

[১] সেই পুঁজিবাদের গুণগত ও পরিমাণগত প্রকৃতি এবং গতি-প্রবণতা নিয়ে বিতর্ক থাকতে পারে।

[২] বর্তমান গ্রন্থে কৃষক (farmer) ও চাষি (peasant) প্রত্যয় দুটি সমার্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

'নিজেরা করি'-র কর্ম এলাকার অধিকাংশই এই নতুন কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থার আওতাধীন, যেখানে প্রায়শই উৎপাদকদের তাদের দ্রব্যের ন্যায্য মূল্য থেকে বঞ্চিত করা হয়। চুক্তিবদ্ধ চাষের সাথে সম্পৃক্ত কৃষকদের বড় একটি অংশই মনে করে, এই ব্যবস্থাটি তাদের জন্য উপকারী নয়; কারণ চুক্তিবদ্ধ চাষের অধীনে, ফসল কাটার পর বাজার মূল্য আমলে না নিয়েই দ্রব্য বিক্রি করতে তারা বাধ্য থাকে। যে প্রতিষ্ঠানগুলো কৃষকদেরকে ধার ও অন্যান্য সেবা প্রদান করে, তারা উৎপাদিত দ্রব্যাদি গ্রেডিং করে একটি মূল্য বেঁধে দেয়, কৃষকরা সেই মূল্যে দ্রব্য বিক্রি করতে বাধ্য থাকে। চুক্তিবদ্ধ চাষ কৃষকদের কাছ থেকে কিছু স্বাধীনতা কেড়ে নেয় – চাষ প্রক্রিয়ার দিকনির্দেশনা দেবার দায়িত্বে থাকে চুক্তি সম্পাদনকারী প্রতিষ্ঠান, এবং কৃষকরা তাদের কথা শুনতে বাধ্য থাকে।

অনেক কৃষকই চুক্তিবদ্ধ চাষের ফলে যে আর্থিক লাভের মুখ দেখে, তার বিনিময়ে নিজেদের পেশাগত স্বাধীনতাকে সীমিত করতে রাজি থাকে। চুক্তিবদ্ধ চাষ কৃষকের আর্থিক ঝুঁকির হার কমায়, তবে এর জন্য যে বিপুল জীবন-জীবিকা সংশ্লিষ্ট মূল্য তাকে দিতে হয় টাকাপয়সার হিসাবে সেটি আদৌ পরিমেয় নয়। এর মধ্যে রয়েছে চুক্তিবদ্ধ তামাক চাষের ফলে সৃষ্ট স্বাস্থ্য অবক্ষয় এবং দীর্ঘমেয়াদে মাটির উর্বরতা হ্রাস (বারকাত ও অন্যান্য, ২০০৮; বারকাত, সোহ্‌রাওয়ার্দী এবং ওসমান, ২০১৫)। এছাড়া, চুক্তিবদ্ধ চাষ খানাগুলোকে অতিমাত্রায় বাজারনির্ভর করে তোলে; এতে তাদের খাদ্য নিরাপত্তা হুমকির সম্মুখীন হয়। চাষকৃত দ্রব্যের বাইরেও চুক্তিবদ্ধ চাষের ওপর নির্ভরশীলতার কারণে কৃষকরা তাদের দর কষাকষির ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে।

আবহমানকাল থেকে ভূমি হচ্ছে গ্রামীণ জীবন-জীবিকার মূখ্য অবলম্বন। চুক্তিবদ্ধ চাষের প্রক্রিয়ায় গরিব কৃষকরা তাদের সামান্য যে 'দুই বিঘে' জমি ছিলো, সেটার ওপরও নিজেদের নিয়ন্ত্রণ হারায়। তারা নিয়ন্ত্রণ হারায় উৎপাদন প্রক্রিয়ায় এবং কৃষির ফলন ও যোগানে। কৃষকদের জমি অন্যদেরকে – যেমন কর্পোরেট কৃষি-ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোকে – ক্রমাগত লিজ দিয়ে দিতে বাধ্য করা হচ্ছে। সর্বোচ্চ ফলন ও মুনাফা অর্জনের তাগিদে, কৃষকদের জমিগুলো দিন দিন অনুর্বর হয়ে পড়ে এবং ভূমি বাজারে দাম হারায়।

শস্য আবর্তনের অনুপস্থিতি এবং জি আর প্রযুক্তির[৩] বহুল ব্যবহারের কারণে, কৃষকদের এটুকু উপলব্ধি হয়েছে যে ধারাবাহিকভাবে কয়েক বছর চুক্তিবদ্ধ চাষ করার পর তাদের জমির উৎপাদনশীলতা এবং মূল্য দুইই কমছে। এ অবস্থায় তারা চাষবাস ছেড়ে দিয়ে জমি বেচে দিতে বাধ্য হচ্ছে এবং এই প্রক্রিয়া জমির কেন্দ্রীভবনে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। গুটি কয়েক জনের হাতে জমি কেন্দ্রীভূত হচ্ছে বলেই গ্রামীণ কৃষকদের জীবন ও জীবিকা দিন দিন কঠিন হয়ে পড়ছে। চুক্তিবদ্ধ চাষের আওতায় বাণিজ্যিক উৎপাদন কৃষকের খাদ্য নিরাপত্তাকে বাজারনির্ভর করে; কেননা তারা খানার ভোগের চেয়ে বাজারের ডাককেই (Call of the Market) উৎপাদন-সিদ্ধান্তে গুরূত্ব দেয়। উৎপাদন প্রক্রিয়ার এই রূপে নির্দিষ্ট কিছু কৃষি কর্ম থেকে নারীর বহিষ্কারণও দৃশ্যমান। স্মরণাতীত কাল থেকে, গ্রামীণ নারীরা আগামী বছরের চাষের জন্য বীজ সংরক্ষণ করে আসছে, কিন্তু বর্তমানে আর সবকিছুর মতোই এই বীজও এখন কর্পোরেট পণ্য (আখতার, ২০১৮)।

উপরোক্ত আলোচনায় এটা পরিষ্কার যে, পত্তনি প্রথা এবং চুক্তিবদ্ধ চাষ প্রক্রিয়ায় গ্রামীণ প্রান্তিক কৃষকের জন্য কিছু তুলনামূলক সুবিধার পাশাপাশি বেশ কিছু বড় মাপের ও বিপর্যয়কর অসুবিধাও দেখা দিয়েছে। প্রান্তিক জনগণের অধিকার রক্ষায় কর্মরত, উন্নয়ন সংগঠন 'নিজেরা করি' তৃণমূল পর্যবেক্ষণে লক্ষ্য করেছে যে, কৃষক এই দুই ধরনের চাষ প্রক্রিয়ায়ই কৃষি উৎপাদনের ওপর তার নিয়ন্ত্রণ হারাচ্ছে। সম্পদ বিশেষত জমির ওপর অধিকার হ্রাস, জমির উর্বরতা হ্রাস, বাধ্য হয়ে জমি বিক্রি, কৃষি কাজ ত্যাগ, খাদ্যের জন্য বাজার নির্ভরতা, কৃষিতে নারীর অংশগ্রহণ সংকোচন প্রভৃতি কর্পোরেট-নিয়ন্ত্রিত কৃষির নানা অভিঘাত গবেষণা প্রতিষ্ঠান হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ সেন্টার (এইচডিআরসি)-র পূর্বের একাধিক গবেষণায়ও উঠে এসেছে[৪]। উল্লেখিত বিষয়গুলোতে আরো সুনির্দিষ্ট ও গভীর, তথ্যনিষ্ঠ অনুসন্ধানের জন্য 'নিজেরা করি' এইচডিআরসি-কে "Present Form and Disempowerment Process of the Rural Peasants: A Case Study on Two Northern Upazilas" বা "গ্রামীণ কৃষকের বর্তমান অবস্থা এবং অ-ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়া: উত্তরবঙ্গের দুটি উপজেলার ওপর একটি সমীক্ষা"- শীর্ষক গবেষণা কর্মটি সম্পাদনের দায়িত্ব দেয়।

১.২ গবেষণার উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি

১.২.১ গবেষণার উদ্দেশ্যাবলি

"বর্তমানে কারা কৃষি উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করছে, উৎপাদন করছে কারা, আর ফল ভোগই বা করছে কারা" – এসব অনুসন্ধান করাই ছিল এই গ্রন্থের আওতাধীন গবেষণার মূল লক্ষ্য।

[৩] উচ্চ ফলনশীল জাতের বীজ, রাসায়নিক সার, কীটনাশক, যান্ত্রিকীকৃত সেচ ইত্যাদি জি আর (গ্রিন রেভলিউশন) বা 'সবুজ বিপ্লব' প্রযুক্তির মধ্যে পড়ে।

[৪] দেখুন: বারকাত ও অন্যান্য (২০০৮); বারকাত, সোহরাওয়ার্দী এবং ঘোষ (২০১১); বারকাত, সোহরাওয়ার্দী এবং ওসমান (২০১৫); বারকাত ও অন্যান্য (২০১৮); বারকাত ও সোহরাওয়ার্দী (২০১৯) এবং বারকাত (২০১৯)।

গবেষণাটির সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যাবলী নিম্নরূপ:

১. সম্পদ বিশেষত ভূমির উপর কৃষক কিভাবে তার অধিকার, স্বাতন্ত্র্য এবং নিয়ন্ত্রণ হারায় তা অনুসন্ধান করা;
২. পত্তনি চাষ এবং চুক্তিবদ্ধ চাষ প্রক্রিয়ায় চাষিদের অংশগ্রহণের মাত্রা (বিশেষত কৃষি খানার শতাংশ, জমি-শ্রম-অন্যান্য সম্পদের নিয়োজন এবং শস্য চাষের নিরিখে) অনুসন্ধান করা;
৩. বিগত দশ বছরে পত্তনি চাষ এবং চুক্তিবদ্ধ চাষের ধারা এবং এর বিবর্তনের পেছনের কারক উপাদানগুলো অনুসন্ধান করা;
৪. এ ধরনের চাষের আওতায় কি পরিমাণ জমি অনুর্বর হয়েছে এবং সেজন্য এ অনুর্বর জমি কি পরিমাণ বিক্রি করতে হয়েছে তা পরিমাপ করা;
৫. পত্তনি চাষ এবং চুক্তিবদ্ধ চাষ প্রক্রিয়ায় কতসংখ্যক কৃষক কৃষি কাজ ছেড়েছে তা অনুসন্ধান করা;
৬. কিভাবে কৃষি খানার খাদ্য নিরাপত্তা বাজার নির্ভর হয়ে পড়ে তা খুঁজে বের করা এবং
৭. পত্তনি চাষ এবং চুক্তিবদ্ধ চাষ প্রক্রিয়ায় নারী কিভাবে কৃষি থেকে উচ্ছেদ হয় তা অনুসন্ধান করা।

১.২.২ গবেষণার পদ্ধতিগত বিষয়[৫]

বর্তমান গবেষণার জন্য প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উভয় উৎস হতে উপাত্ত ও তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রয়োজনীয় প্রাথমিক উপাত্ত ও তথ্য উত্তরাঞ্চলের ২টি উপজেলা, যথা: পীরগঞ্জ (রংপুর) এবং সাঘাটা (গাইবান্ধা) থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে (সারণি ১)।

প্রতিটি উপজেলা থেকে ৩টি করে মোট ৬টি ইউনিয়ন নির্বাচন করা হয়। প্রতিটি ইউনিয়ন থেকে ১টি করে মোট ৬টি গ্রাম নির্বাচন করা হয়। প্রতিটি গ্রাম থেকে ২০টি করে মোট ১২০টি খানা নির্বাচন করা হয়।

সারণি ১: গবেষণায় সংগৃহীত সংখ্যাগত উপাত্ত ও গুণগত তথ্য	
সংখ্যাগত উপাত্ত	**গুণগত তথ্য**
খানা জরিপ (১২০; পীরগঞ্জ: ৬০ এবং সাঘাটা: ৬০)	১) এফজিডি (ফোকাস গ্রুপ আলোচনা) (৪ ; পীরগঞ্জ: ২ এবং সাঘাটা: ২) ২) স্থানীয় কর্মশালা (পীরগঞ্জ: ১ এবং সাঘাটা: ১) ৩) সংশ্লিষ্ট গবেষণা সাহিত্য পর্যালোচনা

প্রাথমিক উৎস হতে সংগৃহীত সংখ্যাগত উপাত্ত ও গুণগত তথ্যের সাথে মাধ্যমিক তথ্যের বিশ্লেষণ প্রক্রিয়া নিচের রেখাচিত্র ১-এ দেখানো হল:

রেখাচিত্র ১: উপাত্ত ও তথ্যের ট্রায়াংগুলেশন

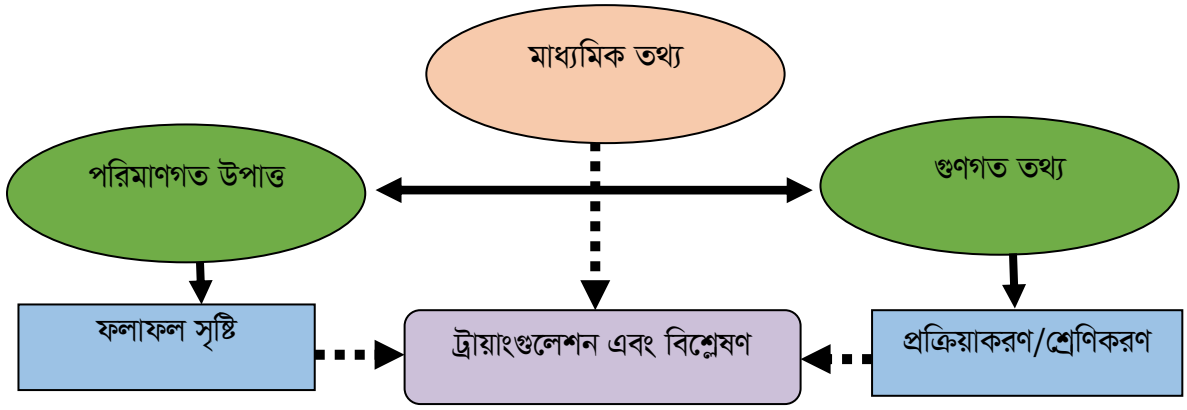

[৫] বিস্তারিত গবেষণা পদ্ধতি, গবেষণা প্রতিবেদনের প্রথম অধ্যায়ে বর্ণিত আছে। দেখুন: Section 1.3, Present Form and Disempowerment Process of the Rural Peasants: A Case Study on Two Northern Upazilas. Dhaka: HDRC & Nijera Kori, 2018.

১.৩ গবেষণা থেকে গ্রন্থ

"বাংলাদেশের কৃষি: পত্তনি চাষ ও চুক্তিবদ্ধ চাষের রাজনৈতিক অর্থনীতি" শীর্ষক গবেষণা গ্রন্থটি "Present Form and Disempowerment Process of the Rural Peasants: A Case Study on Two Northern Upazilas" শীর্ষক গবেষণা প্রতিবেদনের ভিত্তিতে রচিত। গ্রন্থটি, প্রতিবেদনের সরাসরি সরল অনুবাদ নয়। প্রতিবেদনের সংশ্লিষ্ট তত্ত্ব, তথ্য, উপাত্ত, বিশ্লেষণ, সুপারিশ ও টেক্সটের অনেকটুকুই – সবটুকু নয় – এই গ্রন্থ ধারণ করেছে। আবার গ্রন্থটিতে নতুন কিছু তত্ত্ব, তথ্য, উপাত্ত, বিশ্লেষণ, সুপারিশ ও টেক্সট রয়েছে, যা প্রতিবেদনে ছিল না।

ইংরেজি ভাষায় প্রণীত গবেষণা প্রতিবেদনটির মূল লক্ষ্য-গোষ্ঠী ছিল নীতি-নির্ধারক, গবেষক, উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা। পক্ষান্তরে, মূলত: মাঠ-পর্যায়ের উন্নয়ন কর্মীদের লক্ষ্য করে বাংলা ভাষায় এই গ্রন্থটি লেখা। এজন্য প্রতিবেদনে উল্লেখিত বিস্তারিত গবেষণা পদ্ধতির পাশাপাশি দীর্ঘ 'সাহিত্য পর্যালোচনা'র স্থান হয়নি এই গ্রন্থে। প্রতিবেদনের একাধিক পরিশিষ্টও (বিশ্লেষণ সারণি, প্রশ্নপত্র, এফজিডি ও কর্মশালার সংক্ষিপ্ত বিবরণী প্রভৃতি) অন্তর্ভূক্ত হয়নি গ্রন্থটিতে।

অর্থাৎ এই গবেষণা গ্রন্থটি একদিকে সেই গবেষণা প্রতিবেদনের চেয়ে "কম কিছু" (Less than the Report), আবার অন্য দিকে "বেশি কিছু" (More than the Report)।

অধ্যায় ২
পত্তনি চাষ

২.১ ভূমিকা

পত্তনি বা ঠিকা প্রথায় নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের বা শস্যের বিনিময়ে জমির মালিক চাষিকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য (১ বছর বা ১ মৌসুমের জন্য) তার জমি চাষ করার সুযোগ দেয়। বাংলাদেশে তথা ভারতবর্ষে পত্তনি চাষ কোনো নতুন চাষ পদ্ধতি নয় (রুদ্র, ১৯৮৫)। এটি দীর্ঘদিন বর্গা চাষের সাথে সহাবস্থান করে এসেছে। ঐতিহাসিকভাবে বর্গা চাষ বাংলাদেশে জমি লিজ দেয়া-নেয়ার সর্বাধিক চর্চিত রূপ ছিলো। এমনকি এক দশক আগেও, বাংলাদেশে এমন কোনো গ্রাম খুঁজে পাওয়া দুষ্কর ছিলো, যেখানে বর্গা প্রথায় চাষ করা হতো না। কিন্তু আজকের গ্রাম বাংলায় এমন গ্রামও খুঁজে পাওয়া সম্ভব যেখানে একটি খানাও বর্গা চাষের সাথে জড়িত নয় (বারকাত ও অন্যান্য, ২০১৮)। বর্গা চাষের 'শোষণমূলক' এবং 'উৎপাদন-বর্ধন বিরোধী'[৬] বৈশিষ্ট্যের দরুন এই চাষ পদ্ধতি নিয়ে অর্থনীতিবিদদের মধ্যে সবসময়ই বিতর্ক ছিলো (স্মিথ, ১৭৭৬; রিকার্ডো, ১৮১৭ এবং মার্শাল, ১৮৯০)। বাস্তবে, ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমলে, বর্গা চাষের আধাআধি (৫০ ঃ ৫০) চর্চার বিরুদ্ধে কৃষকদের পক্ষ থেকে ব্যাপক প্রতিরোধও গড়ে উঠেছিলো; তেভাগা আন্দোলন যার একটি উদাহরণ[৭]। এই প্রেক্ষাপটে বর্গা চাষ পদ্ধতির বিকল্পের আবির্ভাব ছিল অনিবার্য; পত্তনি বা ঠিকা প্রথায় চাষ তেমনি একটি বিকল্প।

উৎপাদনশীলতা ও চাষ-স্বাধীনতার ওপর ভর করে দ্রুত প্রসারিত হলেও পত্তনি চাষ কৃষকের জন্য বিশেষত: ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের জন্য অবিমিশ্র আশীর্বাদ বয়ে আনেনি; বরং দিন দিন এটি তাদের নানা দুর্দশার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। পত্তনি চাষের ওপর গ্রামাঞ্চলের আধিপত্যশীল সম্পত্তি সম্পর্ক এবং ক্ষমতা কাঠামোর ব্যাপক প্রভাব কৃষকদের দুর্দশাকে বাড়িয়ে তোলে। গরিব কৃষক ক্ষমতা কাঠামোয় তার অধঃস্তন অবস্থানের জন্য জমির মালিকের সাথে দরকষাকষির ক্ষেত্রে নিজেকে দুর্বল অবস্থানে আবিষ্কার করে। তার ওপর পদ্ধতিটি সুপরিচালিত নয়, যে কারণে কৃষকরা প্রায়শই বঞ্চিত হয়। পত্তনি চাষের ক্ষেত্রে জমির মালিক ও চাষির মাঝে ঝুঁকি ভাগাভাগির কোনো ব্যবস্থা নেই। তাই কখনো লোকসান হলে এর পুরোটাই বইতে হয় কৃষককে। লোকসান বইতে না পেরে এ চাষের প্রক্রিয়ায় বহু কৃষক চাষবাস ছেড়ে চলে যায়।

উল্লেখিত দুর্দশার পাশাপাশি কৃষি ও কৃষক-বিরোধী আরো কিছু বৈশিষ্ট্য ও ফলাফল পত্তনি চাষ প্রথায় ক্রমবর্ধমান হারে দৃশ্যমান ও অনুভূত হচ্ছে যা বর্তমান অধ্যায়ে পর্যালোচনা করা হয়েছে।

২.২ পত্তনি চাষে খানার অংশগ্রহণের মাত্রা

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে কৃষকদের মধ্যে, বিশেষত ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে, পত্তনি চাষের প্রবণতা বেড়ে চলেছে। যেমনটা শুরুতেই বলা হয়েছে, বর্তমানে এমন কিছু গ্রামের দেখা মেলে যেখানে পত্তনি চাষ ও এরকম আরো কিছু বাণিজ্যিক লিজ পদ্ধতি (যেমন: খাই-খালাসি, বন্ধকি প্রভৃতি) বর্গাচাষ প্রথার অবসান ঘটিয়েছে। পত্তনি চাষ প্রথায়, একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দেয়ার পর, কৃষক তার জমি নিজের ইচ্ছেমতো চাষ করতে এবং উচ্চ মাত্রার উৎপাদনশীলতা নিশ্চিত করার জন্য সর্বোচ্চ উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে। অন্যান্য কারণের (২.৩ অনুচ্ছেদে যেগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে) পাশাপাশি এই 'ইচ্ছে মাফিক চাষ করতে পারার স্বাধীনতা' এবং 'উচ্চ মাত্রার উৎপাদনশীলতা নিশ্চিত করার আকাঙ্ক্ষা' পত্তনি চাষে খানার অংশগ্রহণের মাত্রা বাড়িয়ে দিচ্ছে।

পরিমাণে কম হলেও বেশ আগে থেকেই রংপুরের পীরগঞ্জ ও গাইবান্ধার সাঘাটায় পত্তনি চাষের প্রচলন ছিল; বর্তমানে এই প্রথায় চাষের পরিমাণ বাড়ছে। ফোকাস গ্রুপ আলোচনার (এফজিডি) তথ্যানুযায়ী, বর্তমানে পীরগঞ্জের তুলনায় সাঘাটায় পত্তনি চাষের প্রসার বেশি। পীরগঞ্জে প্রায় ১০ শতাংশ খানা পত্তনি চাষের সাথে জড়িত; পক্ষান্তরে, সাঘাটায় এক-পঞ্চমাংশ (২০ শতাংশ) খানা এই প্রথায় চাষের

[৬] অতিরিক্ত শ্রম ও প্রচেষ্টা নিয়োগ করে অতিরিক্ত উৎপাদনের অর্ধেকটা জমির মালিকদের দিয়ে দিতে হয় বলে কৃষকদের মাঝে উৎপাদন বাড়ানোর প্রণোদনা থাকে কম।

[৭] এসব আন্দোলন-সংগ্রামের সংক্ষিপ্ত উল্লেখ ও সেগুলোর পথিকৃৎদের নামের জন্য দেখুন, বারকাত (২০১৬)।

সাথে জড়িত। পীরগঞ্জ ও সাঘাটার এই উপাত্ত ব্যবহার করে সারণি ২-এ রংপুর, গাইবান্ধা ও সমগ্র বাংলাদেশে পত্তনি চাষের সাথে জড়িত সম্ভাব্য খানার সংখ্যা এবং খানার সদস্য সংখ্যা নিরূপণ করা হয়েছে[৮]।

সারণি ২: পত্তনি চাষের সাথে জড়িত সম্ভাব্য খানার সংখ্যা এবং খানার সদস্য সংখ্যা		
	সম্ভাব্য খানার সংখ্যা	সম্ভাব্য খানার সদস্য সংখ্যা
রংপুর	৩৫,৫৬৩	১,৪২,২৫২
গাইবান্ধা	৬৫,৩৫৪	২,৯৪,০৯৩
বাংলাদেশ	২২,৭৭,৪৭৮	৯৩,৬০,৪৩৫

কৃষি খামার হিসেবে গ্রামীণ খানার সক্রিয়তার পেছনে খানার আকার একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক হিসেবে কাজ করতে পারে। অ-কৃষি কর্মকাণ্ড ও আকর্ষণীয় অভিবাসন সুযোগের অনুপস্থিতিতে একটি বৃহদাকার খানার সামনে চাষাবাদে জড়িত থাকা উত্তম একটি বিকল্প হতে পারে (হোসেন এবং বায়েস, ২০১৫)। আবার খোরাকি পর্যায় থেকে বাণিজ্যিক পর্যায়ে খানার উত্তরণের ক্ষেত্রেও এর আকার অন্যান্য কারক উপাদানের পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। বর্তমান গবেষণার খানা জরিপের উপাত্তানুযায়ী, পত্তনি খানার গড় আকার ৪.৩ – যা গ্রামীণ খানার জাতীয় গড়ের (৪.১) চেয়ে কিছুটা বেশি। খানার আকার সর্বোচ্চ ৮ থেকে সর্বনিম্ন ২; তিন-চতুর্থাংশ পত্তনি খানার আকার ৪ অথবা ৪ এর চেয়ে বেশি। সাঘাটার খানাগুলোর গড় আকার (৪.৫), পীরগঞ্জের খানাগুলোর গড় আকারের (৪.০) চেয়ে বেশি।

গ্রাম বাংলায় সাধারণত কম-বেশি এক-দশমাংশ খানা, নারী প্রধান। এসব খানার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ পত্তনি চাষে জড়িত, পত্তনি চাষি খানাগুলোর প্রায় ১৩ শতাংশ নারী প্রধান খানা। এই উপাত্ত ব্যবহার করে সারণি ২-এ হিসেবকৃত সম্ভাব্য খানার সংখ্যা থেকে এই হিসাব করা যায় যে, রংপুরের প্রায় সাড়ে চার হাজার (৪,৬২৩ টি) নারী প্রধান খানা; অন্যদিকে গাইবান্ধার প্রায় সাড়ে আট হাজার (৮,৪৯৬ টি) নারী প্রধান খানা পত্তনি চাষের সাথে জড়িত। পুরুষের অনুপস্থিতিতে খানা-প্রধান নারী অথবা সেই নারীর সমর্থনে খানার অন্য কোনো সামর্থ্যবান পুরুষ পত্তনিতে জমি লিজ নিয়ে, অর্থাৎ ফসল উৎপাদনের আগেই নগদ অর্থ পরিশোধের বিনিময়ে চাষ করছে। এই চাষ-চর্চা কি সেই খানার কঠিন জীবন সংগ্রামের বহিঃপ্রকাশ, নাকি খানার বাণিজ্যিক খামারে রুপান্তরিত হওয়ার লক্ষণ – সেটি নতুন গবেষণার বিষয়।

পত্তনি চাষের সাথে জড়িত খানা প্রধানদের গড় বয়স ৪৭.২ বছর (পীরগঞ্জের ৪৯.৪ বছরের বিপরীতে সাঘাটায় ৪৫.৩ বছর)। খানা প্রধানরা বয়স্ক এবং অভিজ্ঞ – এফজিডি ও কর্মশালা থেকে জানা যায় – বিশেষত কৃষি-অভিজ্ঞ। তবে আনুষ্ঠানিক শিক্ষায় তারা পিছিয়ে (গড় শিক্ষা বছর ৬.৩); সাঘাটার খানা প্রধানরা এক্ষেত্রে বেশি পিছিয়ে (পীরগঞ্জের ১০.৫ শিক্ষা বছরের বিপরীতে সাঘাটার ৪.০ শিক্ষা বছর)।

পত্তনি খানাগুলোর প্রায় ৬৩ শতাংশ সদস্যের বয়স ১৬ থেকে ৬০ বছর – যারা কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর অংশ। সারা দেশের মতো এই খানাগুলোও 'জনমিতিক লভ্যাংশ'[৯] উপভোগ (?) করছে। প্রকৃত বিচারে, চাষাবাদে নানাভাবে লোকসান দেয়ার পরও এই অভ্যন্তরীণ শ্রমবহুলতাই পত্তনি প্রথায় জমি নিয়ে উদ্বৃত্ত শ্রম ব্যবহার করতে খানাগুলোকে উৎসাহিত করে।

ঐতিহাসিকভাবে প্রান্তিক, ভূমিহীন কৃষি খানাগুলোই মূলত জমি বর্গা নিয়ে আসছে। বর্গা প্রথার স্থলে পত্তনি প্রথার ব্যাপক প্রচলনের পরও অবস্থা সেই আগের মতই রয়ে গেছে অর্থাৎ ভূমিহীন কৃষি খানাগুলোই মূলত পত্তনিতে জমি নিচ্ছে। পীরগঞ্জ ও সাঘাটার খানা জরিপের বিশ্লেষণে দেখা যায়, গড়ে প্রতিটি খানা প্রায় ৩৪ শতক জমির (প্রায় ২৪ শতক কৃষি জমিসহ) মালিক – অর্থাৎ প্রায় সবাই

[৮] বিস্তারিত হিসাব পদ্ধতি গবেষণা প্রতিবেদনের প্রথম অধ্যায়ে বর্ণিত গবেষণা পদ্ধতিতে উল্লেখ করা হয়েছে। দেখুন: Box 1.1, Section 1.3, Present Form and Disempowerment Process of the Rural Peasants: A Case Study on Two Northern Upazilas. Dhaka: HDRC & Nijera Kori, 2018.

[৯] একটি দেশের জনগোষ্ঠীর বয়স-কাঠামোয় পরিবর্তনের ফলে যে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়, তাকে 'জনমিতিক লভ্যাংশ' বলে। একটি সমাজ যখন 'স্বল্পায়ু সদস্যের বড় পরিবার' থেকে 'দীর্ঘায়ু সদস্যের ছোট পরিবার' গঠনের দিকে বাঁক নেয়, তখন এই বিশেষ ধরনের লভ্যাংশ অর্জিত হয়। এই বাঁক বদলের সময় সেই অর্থনীতির শ্রমশক্তি, জনগোষ্ঠীর নির্ভরশীল অংশের তুলনায় অনেক দ্রুত হারে বাড়ে। (https://populationeducation.org/what-demographic-dividend/)

প্রান্তিক, ভূমিহীন খানা। ভূমিহীনতা যে খানাগুলোর পত্তনিতে জমি নেয়ার অন্যতম মূল কারণ (অন্যান্য কারণ ২.৩ অনুচ্ছেদে বিস্তারিত আলোচিত হবে) তা এই উপাত্ত থেকে পরিষ্কার।

জরিপের আওতাভুক্ত প্রায় ৯৭ শতাংশ খানা পত্তনিতে কেবল জমি নেয়, বাকি ৩ শতাংশ খানা পত্তনিতে জমি নেয় এবং দেয়।

পত্তনিতে জমি নেয়ার ক্ষেত্রে যেমন প্রান্তিক ও ভূমিহীন খানাগুলো একচেটিয়াভাবে এগিয়ে, তেমনি পত্তনিতে জমি দেয়ার ক্ষেত্রে ভূমি-উদ্বৃত্ত বড় ও মাঝারি খানাগুলো স্বাভাবিকভাবেই এগিয়ে রয়েছে (সারণি ৩)। পীরগঞ্জ ও সাঘাটায় বড় (৪২.৯%) এবং মাঝারি (৩১.৭%) খানাগুলো থেকেই মূলত পত্তনি জমির যোগানের বড় অংশ (তিন-চতুর্থাংশ) আসে। বড় ও মাঝারি খানাগুলো নিজেদের আবাদকে 'আরো বড়' না করে কেন পত্তনিতে কিছু জমি লিজ দিয়ে দেয়? এ প্রশ্নের একটি উত্তর মেলে ব্রিটিশ ধ্রুপদী অর্থনীতিবিদ ডেভিড রিকার্ডো'র খাজনা তত্ত্ব ও বর্তমান গবেষণার আওতায় সম্পাদিত কর্মশালা ও এফজিডি থেকে প্রাপ্ত তথ্যে। রিকার্ডো'র তত্ত্ব অনুযায়ী, সবচেয়ে অনুর্বর জমিটিই লিজের জন্য বেছে নেওয়া হয় – এই তত্ত্বের সমর্থনে বর্তমান গবেষণার তথ্য বলে, বড় ও মাঝারি খানাগুলো নিজেদের নির্দিষ্ট কিছু জমিকেই বছরের পর বছর লিজ দেয়; যে জমিগুলোর উর্বরাশক্তি ইতোমধ্যেই হ্রাস পেয়েছে (এ নিয়ে আরো আলোচনা করা হয়েছে অনুচ্ছেদ ২.৫ এবং ২.৬-এ)।

প্রায় ১০ শতাংশ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষি খানার কাছ থেকেও জরিপকৃত খানাগুলো পত্তনিতে জমি নিয়েছে; এই খানাগুলো নিঃসন্দেহে ভূমি-উদ্বৃত্ত নয়। তবে নিজেরা চাষ না করে অন্যকে জমি চাষ করতে দেয়ার পেছনে সক্রিয় অন্যান্য কারণের পাশাপাশি তাদের শ্রম ও পুঁজির ঘাটতি কাজ করতে পারে।

গ্রাম বাংলায় অ-কৃষি খানার সংখ্যা বাড়ছে (বারকাত ও অন্যান্য, ২০১৮; বিবিএস, ২০১৭)। এ ধরনের খানার আয়ের বড় অংশই আসে চাষাবাদ-বহির্ভূত ব্যবসা-বাণিজ্য, রেমিট্যান্স প্রভৃতি থেকে। বড় অ-কৃষি খানাগুলো তাদের উদ্বৃত্ত আয় থেকে জমি-জমা কিনে। ব্যক্তিগত ব্যবহার (বাড়ি, বাগান, পুকুর প্রভৃতি) ও অ-কৃষি কর্মকাণ্ডের জন্য ব্যবহৃত জমির বাইরে আবাদযোগ্য জমি তারা বর্গাবাজারে বিনিময় করে, যার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ পত্তনি শর্তে হাত বদল হয়। খানা জরিপ থেকে দেখা যায়, ৬.৩ শতাংশ পত্তনি খানার জমির যোগানদার বড় অ-কৃষি খানা।

অনুপস্থিত জমির মালিকদের জন্য পত্তনি শর্তে জমি দেয়া বিশেষ সুবিধাজনক। আগে বর্গা প্রথায় ফসলের ভাগ নির্ণয়, ভাগকৃত ফসল বিক্রি প্রভৃতি নিয়ে অনুপস্থিত জমির মালিকদের এক ধরনের 'ঝামেলা'র মধ্য দিয়ে যেতে হত; এখন মৌসুম বা বছরের শুরুতেই তারা পত্তনির 'নগদ' খাজনা বুঝে নেয়। ৪.৮ শতাংশ খানা অনুপস্থিত জমির মালিকদের কাছ থেকে পত্তনিতে জমি লিজ নিয়ে থাকে। এছাড়াও ৪.৮ শতাংশ খানা, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে পত্তনিতে জমি লিজ নেয় (সারণি ৩)।

সারণি ৩: পত্তনি চাষের জন্য খানাগুলো যাদের কাছ থেকে জমি ইজারা নিয়েছে (%)	
ভূমি মালিকের ধরনসমূহ	খানা
ছোট এবং প্রান্তিক কৃষি খানা	৯.৫
মাঝারি কৃষি খানা	৩১.৭
বড় কৃষি খানা	৪২.৯
বড় অ-কৃষি খানা	৬.৩
অনুপস্থিত জমির মালিক	৪.৮
প্রতিষ্ঠান	৪.৮

পত্তনিতে জমি নেয় এমন প্রায় ৭ শতাংশ খানা আগে কৃষি তথা চাষাবাদের সাথে জড়িত ছিল না। সম্ভবত বাণিজ্যিক কৃষির মুনাফার আকর্ষণ এ সকল খানার উল্লেখযোগ্য একটি অংশকে পত্তনিতে জমি নিয়ে (ক্রমবর্ধমান খাজনার হার সত্ত্বেও) কৃষি কাজে টেনে এনেছে।

এক দশকেরও বেশি সময় ধরে পীরগঞ্জ ও সাঘাটায় পত্তনি প্রথায় চাষাবাদের প্রচলন থাকলেও, খানা জরিপের উপাত্ত বিশ্লেষণে দেখা যায়, গড়ে প্রায় ৬ বছর ধরে খানাগুলো পত্তনি চাষাবাদে জড়িত রয়েছে। স্থানীয় পর্যায়ের কর্মশালা থেকে প্রাপ্ত তথ্যে এই দ্বৈত পর্যবেক্ষণের একটি ব্যাখ্যা মেলে – কিছু খানা বেশ কিছু দিন ধরে এ ধরনের চাষাবাদে জড়িত থাকলেও বেশিরভাগ খানাই সম্প্রতি এ ধরনের চাষাবাদে সম্পৃক্ত হয়েছে।

সর্বশেষ বছরে (২০১৭ সালে) খানাগুলো পত্তনি প্রথায় গড়ে প্রায় ৮০ শতক জমি নিয়েছে। এক্ষেত্রে পীরগঞ্জের খানাগুলো গড়ে প্রায় ১ একর (৯৮.০ শতক) জমি পত্তনি নিলেও সাঘাটার খানাগুলোর লিজ নেয়া জমির পরিমাণ আধা একরের কিছু বেশি (৬২.৮ শতক)। অর্থাৎ সাঘাটার খানাগুলোর গড় আকার (৪.৫), পীরগঞ্জের খানাগুলোর গড় আকারের (৪.০) চেয়ে বেশি হলেও তারা পত্তনি প্রথায় কম জমি লিজ নেয়।

খানাগুলোর মাঝে পত্তনি চাষের প্রসার যেমন হচ্ছে, তেমনি এই প্রথার চাষাবাদে খানাগুলোর বিনিয়োগও – শ্রম, জমি, মূলধন প্রভৃতি – বাড়ছে (সারণি ৪)। এক-তৃতীয়াংশের বেশি খানার ক্ষেত্রে পত্তনি চাষাবাদে জমির নিয়োজন বেড়েছে। পত্তনি চাষাবাদে জমি ছাড়াও জড়িত খানাগুলোর গৃহস্থ শ্রম (৪৯.২% খানার ক্ষেত্রে), ভাড়া করা শ্রম (৭৯.৪% খানার ক্ষেত্রে) এবং খানার অন্যান্য সম্পদের (৫৪% খানার ক্ষেত্রে) নিয়োজন বেড়েছে । খানার অন্যান্য সম্পদের মধ্যে রয়েছে কৃষি যন্ত্রপাতি। গ্রামীণ কৃষি ধীরলয়ে যান্ত্রিকীকরণের দিকে এগুচ্ছে; এক্ষেত্রে পত্তনি খানার অংশগ্রহণের হার বেশি বলেই কর্মশালা ও এফজিডি-তে অংশগ্রহণকারীরা অভিমত দিয়েছেন। যে সকল খানার ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ ও বহিঃস্থ শ্রমশক্তির নিয়োজন কমেছে, তাদের একটি বড় অংশের ক্ষেত্রে শ্রমশক্তির প্রতিস্থাপন ঘটেছে কৃষি যন্ত্রপাতি দিয়ে।

সারণি ৪: পত্তনি চাষের ক্ষেত্রে খানার সম্পদ নিয়োজনের পরিবর্তন (%)

সম্পদ	খানার সম্পদ নিয়োজন		
	বেড়েছে	কমেছে	অপরিবর্তিত
খানার শ্রম শক্তি	৪৯.২	১২.৭	৩৮.১
খানা-বহির্ভূত শ্রম শক্তি	৭৯.৪	১২.৭	৭.৯
জমি	৩৪.৯	১৪.৩	৫০.৮
অন্যান্য সম্পদ	৫৪.০	৪.৮	৪১.৩

মূলত বাজারে বিক্রির জন্যই খানাগুলো পত্তনি জমিতে ফসল উৎপাদন করে – সেটি যেমন অর্থকরী ফসল হতে পারে, তেমনি হতে পারে খাদ্যশস্য। রংপুরের পীরগঞ্জ ও গাইবান্ধার সাঘাটার প্রায় সব কৃষকই পত্তনি জমিতে ধান উৎপাদন করে; খানাগুলো তাদের মোট ধানের ৫০.৪ শতাংশ উৎপাদন করে পত্তনি জমিতে। ধানের পরই পত্তনি জমিতে কৃষকেরা সবচেয়ে বেশি সবজি চাষ করে; খানাগুলো তাদের মোট সবজির ২৪ শতাংশ উৎপাদন করে পত্তনি জমিতে।

২.৩ পত্তনি চাষের বিবর্তনের কারণসমূহ

পত্তনিতে জমি নেয়ার প্রবণতা যেমন বাড়ছে, তেমনি জমির মালিক কর্তৃক পত্তনিতে জমি দেয়ার হারও বাড়ছে এবং তা বেড়ে যাচ্ছে নানা কারণে। ক্রমবর্ধমান হারে জমির মালিক (বিশেষত বড় ও মাঝারি) কৃষি ছেড়ে, গ্রাম ছেড়ে অ-কৃষি খাত ও শহর-মুখী হচ্ছে; তাদের কাছে বর্গার বা ভাগ চাষের বিভাজিত ফসলের চেয়ে নগদ টাকার আকর্ষণ বেশি। পত্তনি জমির নগদ খাজনা তারা শহরে ভোগ বা বিনিয়োগ করে। তাহলে উৎপাদন সম্পর্কের নিরিখে এ কেমন পুঁজিবাদ যখন পত্তনি জমির মালিকের প্রাপ্ত কৃষিজ উদ্বৃত্ত কৃষির সম্প্রসারিত পুনরুৎপাদনে কোনো ভূমিকাই রাখছে না?

প্রতি বছর বা প্রতি মৌসুমে পত্তনি খাজনার হার বাড়ানোর সুযোগ থাকে, যা জমির মালিককে পত্তনিতে জমি দেয়ার ব্যাপারে ব্যাপক উৎসাহ যোগায়। রংপুর ও গাইবান্ধায় বিগত ৯ বছরে ১ বিঘা জমির পত্তনি খাজনা গড়ে প্রায় ৪,০০০ টাকা পর্যন্ত বেড়েছে – শুরুর গড়ে প্রায় ৫,০০০ টাকা থেকে সর্বশেষ বছরে গড়ে প্রায় ৯,০০০ টাকা। উপরে দেখলাম পত্তনি জমির মালিক তার প্রাপ্ত উদ্বৃত্ত কৃষির সম্প্রসারিত পুনরুৎপাদনে বিনিয়োগ করছে না, আর এখন দেখলাম সেটা না করেই তারা উত্তরোত্তর বেশি পত্তনি খাজনা পাচ্ছেন। এটাই বা পুঁজিবাদী সম্পর্কের কেমন রূপ নির্দেশ করে?

প্রতি বছর বা প্রতি মৌসুমে পত্তনি গ্রহীতা পরিবর্তনের সুযোগ থাকে। তাই মালিক যখন দেখে, বর্তমান পত্তনি নেয়া চাষি 'বিশেষ সুবিধার না' বা বর্তমান চুক্তির শর্তাবলী তার জন্য 'বিশেষ অনুকূলে নয়', তখন সে তার পরিবর্তে অন্য কোনো চাষিকে পত্তনিতে জমি দেয়ার সুযোগ নেয়। অন্যান্য কারণের পাশাপাশি ফি বছর চাষি পরিবর্তনের এই 'নমনীয়তা'-র সুযোগ নেয়ার জন্য পত্তনি চাষের ক্ষেত্রে কোনো আনুষ্ঠানিক, লিখিত চুক্তির ব্যাপারে জমির মালিকের আগ্রহের ঘাটতি থাকে। খানা জরিপের উপাত্তানুযায়ী, প্রায় শতভাগ ক্ষেত্রেই পত্তনিতে জমির আদান-প্রদান হয় কোন ধরনের লিখিত চুক্তি ছাড়া। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে পত্তনি জমিতে মালিক তার প্রাপ্ত

উদ্বৃত্ত কৃষির সম্প্রসারিত পুনরুৎপাদনে বিনিয়োগ করছেন না; সেটা না করেই উত্তোরত্তর পত্তনি খাজনা বেশি পাচ্ছেন এবং এসবই পারছেন কোনো ধরনের লিখিত চুক্তি ছাড়া। এসবই কি কৃষিতে এক ধরনের অচিরায়ত পুঁজিবাদ অথবা বিকৃত পুঁজিবাদ অথবা উত্তরণকালীন উৎপাদন সম্পর্কের লক্ষণ?

কৃষকের পত্তনিতে জমি নেয়ার প্রধান ৩ ধরনের কারক উপাদান হচ্ছে: ভূমিহীন কৃষকের নিছক খোরাকি বা জীবিকার চাহিদা পূরণ, স্বচ্ছল কৃষকের মুনাফা আকাঙ্ক্ষা (বেশী লাভ, বেশী উৎপাদন, বাণিজ্যিক উৎপাদন প্রভৃতি) এবং শ্রেণি নির্বিশেষে কৃষকের 'ইচ্ছেমাফিক চাষাবাদের অভিপ্রায়' (সারণি ৫)।

পীরগঞ্জ ও সাঘাটার খানা জরিপের উপাত্ত অনুসারে, প্রান্তিক কৃষকদের পত্তনি চাষের আওতায় জমি লিজ নেয়ার প্রধান কারণ ভূমিহীনতা (৩৮.১%), এর পরই আছে ফসলের সবটুকু কৃষকের নিজের কাছে রাখতে পারার স্বাধীনতা (২৮.৬%) এবং অধিক মুনাফা অর্জনের আকাঙ্ক্ষা (২৫.৮%)। স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, উৎপাদকদের দারিদ্র্য এবং মানবেতর অবস্থা থেকে উত্তরণের আকাঙ্ক্ষা এই প্রক্রিয়াকে উৎসাহিত করায় ভূমিকা রাখে। এই কৃষকদের যদি যথেষ্ট জমি থাকতো, তাহলে তারা ক্রমবর্ধমান খাজনা দিয়ে জমি লিজ নিতো না, যেখানে ফসলহানির সবটুকু দায় তাদেরই বইতে হয়। অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য উৎকণ্ঠায় না থেকে বরং নিজেদের জমি চাষ করেই তারা জীবিকা নির্বাহ করতে পারতো। পত্তনি চাষের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তার পেছনে আছে কৃষকদের মাঝে কাঠামোগত বৈষম্য।

কিছু কৃষক এই ব্যবস্থার অধীনে জমি লিজ নেয় একাধিক ফসল ফলানোর উদ্দেশ্যে (১১.১%) এবং নিজের ইচ্ছেমত চাষ করার স্বাধীনতা থাকার কারণে (১১.১%)। খুব কম সংখ্যক কৃষকই (৩.২%) এই ব্যবস্থার অধীনে জমি লিজ নেয় জমির সুবিধাজনক অবস্থানের দরুন, যা থেকে বোঝা যায় অন্যান্য (অনুমিত) সুবিধার জন্য কৃষকেরা জমির অবস্থানের ব্যাপারে ছাড় দেয়।

সারণি ৫: পত্তনি চাষে খানার অংশগ্রহণের প্রধান কারণসমূহ [একাধিক উত্তর] (%)	
প্রধান কারণসমূহ	খানা
মালিকানাধীন কৃষি জমি নেই কিংবা থাকলেও অপর্যাপ্ত	৩৮.১
ফসল ভাগাভাগির প্রয়োজন নেই	২৮.৬
আরো বেশী লাভ করতে	২৫.৪
বেশী ফসল পেতে	১৪.৩
একাধিক ফসল উৎপাদন করতে	১১.১
নিজের ইচ্ছানুযায়ী চাষ করতে	১১.১
বাণিজ্যিকভাবে লাভজনক ফসল উৎপাদন করতে	৬.৩
সুবিধাজনক জায়গায় জমি	৩.২
জমির উর্বরতা বাড়াতে	১.৬

২.৪ পত্তনি চাষের ফলে কৃষির ওপর কৃষকের অধিকার, স্বাতন্ত্র্য এবং নিয়ন্ত্রণ হ্রাস

এক-তৃতীয়াংশ পত্তনি চাষি খানার ধারণা, এই প্রথায় চাষের ফলে তারা ইতোমধ্যেই জমির উপর অধিকার হারিয়েছেন। পত্তনি জমির মালিক নিজের সুবিধামত প্রতি বছর টাকা বাড়ায়; এতে কৃষকদের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়; কে আগে নেবে, এতে জমির দাম আরও বাড়ে। তাই আগে যে সব গরীব চাষি বর্গা চাষ করত, তাদের বড় অংশই এখন আর নগদ খাজনা দিয়ে পত্তনিতে জমি নিয়ে চাষ করতে পারছে না।

পত্তনিতে জমি নিতে অগ্রিম টাকা দিতে হয়; অগ্রিম টাকা দিতে পুঁজি সংগ্রহের জন্য কৃষককে অন্য পেশায় যেতে হচ্ছে। বন্যা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ যাই ঘটুক না কেন ফসলহানির সব ক্ষতির দায়ভার কৃষকের। একবার ফসল নষ্ট হলে, পরবর্তীতে ঐ চাষি ঋণগ্রস্থ হয়ে পড়ে; তার আর অগ্রিম টাকা দিয়ে পত্তনিতে জমি নেয়ার ক্ষমতা থাকে না। আবার এক বছর ভাল ফসল পেল, কিন্তু পরের বছর জমি পাবে কিনা তার নিশ্চয়তা নেই। যে কোনো কারণেই জমির মালিক জমি অন্য কাউকে দিয়ে দিতে পারে; এতে সেই পত্তনি চাষির নিয়ন্ত্রণ নেই।

পীরগঞ্জ ও সাঘাটার খানা জরিপের উপাত্ত ব্যবহার করে হিসেব করা যায় যে, পত্তনি চাষ প্রক্রিয়ায় সমগ্র বাংলাদেশের ২২,৭৭,৪৭৮ টি পত্তনি চাষি খানার ৭১.৭ শতাংশ খানা অর্থাৎ প্রায় সাড়ে ১৬ লক্ষ পত্তনি চাষি খানা বা প্রায় ৬৭ লক্ষ মানুষ ইতোমধ্যেই জমির উর্বরতা হ্রাস, ঋণগ্রস্ততা ও আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে।

২.৫ পত্তনি চাষের ফলে জমির উর্বরতা হ্রাস

জমির মালিকের সাথে ফসল ভাগাভাগি করতে হয় না বলেই পত্তনি জমিতে কৃষকরা অতিরিক্ত শ্রম ব্যবহার করে সর্বোচ্চ উৎপাদন স্তরে পৌঁছাতে চায়। এছাড়া, সর্বোচ্চ উৎপাদন নিশ্চিতকল্পে কৃষকরা মাত্রাতিরিক্ত রাসায়নিক সার, কীটনাশক, বালাইনাশক প্রভৃতি ব্যবহার করে এবং শস্য নিবিড়তা বাড়িয়ে দেয়। এসব রাসায়নিকের মাত্রাতিরিক্ত প্রয়োগ এবং কোনো বিরতি ছাড়াই জমির ব্যবহারের ফলে জমি তিলে তিলে তার উর্বরতা হারায়।

পরবর্তী মৌসুমে জমি পাওয়ার নিশ্চয়তা নেই বলে কৃষকরা পত্তনি জমিতে গোবর, জৈব সার বা এমন কোন পরিবেশ-বান্ধব প্রযুক্তি ব্যবহার করে না; অথচ, এগুলো দীর্ঘমেয়াদে জমির উর্বরা শক্তি বজায়ে সহায়ক। ফলে পত্তনি জমি দিনের পর দিন অনুর্বর থেকে অনুর্বরতর এবং এক পর্যায়ে অনুর্বরতম হয়ে পড়ে।

বর্তমান গবেষণায় দেখা যাচ্ছে, বিগত দশ বছরে পত্তনি চাষের ফলে খানা প্রতি গড় অনুর্বর জমির পরিমাণ সাঘাটার (৮ শতক) চেয়ে পীরগঞ্জে বেশি (১৯.৭ শতক)। পীরগঞ্জ ও সাঘাটার এই উপাত্তের ভিত্তিতে হিসেব করা যায় যে, পত্তনি চাষের ফলে বাংলাদেশের মোট কৃষিজমির (২২২ লাখ একর) ১.৪ শতাংশ বিভিন্ন মাত্রায় অনুর্বর হয়ে পড়েছে, যার পরিমাণ প্রায় ৩ লক্ষ ১০ হাজার একর বা ৯ লক্ষ ৩০ হাজার বিঘা (সারণি ৬); বাংলাদেশের ১৪টি জেলার একক আয়তন এই পরিমাণের চেয়ে কম।[১০]

সারণি ৬: পত্তনি চাষের ফলে অনুর্বর জমি

	খানা প্রতি গড় অনুর্বর জমি (শতক)	সম্ভাব্য মোট খানার সংখ্যা	সম্ভাব্য মোট অনুর্বর জমির পরিমাণ (একর)
রংপুর	১৯.৭	৩৫,৫৬৩	৭,০০৫.৯১
গাইবান্ধা	৮	৬৫,৩৫৪	৫,২৫২.৩২
বাংলাদেশ	১৩.৬	২২,৭৭,৪৭৮	৩,০৯,৭৩৭

অনুর্বর জমি যেমন ফলন কমিয়ে দেয়, তেমনি কোনো কোনো কৃষি দ্রব্যের উৎপাদন চিরতরে বন্ধের আশঙ্কা তৈরি করে (বক্স ১)।

বক্স ১: দেশী সাগর কলা হারিয়ে যাচ্ছে!

কলা চাষের জন্য প্রয়োজনীয় বেলে দো-আঁশ মাটির গুণাগুণ এখন আর তেমন অক্ষুন্ন নেই। অতিমাত্রায় রাসায়নিক সার ব্যবহারের কারণে মাটি শক্ত হয়ে গেছে। এতে দেশী জাতের সাগর কলার চাষ করা যাচ্ছে না। দেশী সাগর কলাগাছের চারা রোপন করলে গাছ বড় হয় না। আবার গাছ হলেও, কলার ছড়িতে বেশি কাঁদি জন্মাতে দেখা যায় না। কলার আকারও অনেক ছোট হয়ে এসেছে। মাটির কারণে এখন কলার ছড়িতেও রোগের প্রাদুর্ভাব বেশি দেখা যাচ্ছে। এ কারণে অনেক চাষি দেশী সাগর কলার চাষাবাদ বন্ধ করে চম্পা, সবরি ও অন্যান্য জাতের কলা আবাদ শুরু করেছেন।

সূত্র: শাহীন (২০১৮)

২.৬ পত্তনি চাষের ফলে অনুর্বর জমির বিক্রি

গ্রামীণ কৃষি খানার জমির ক্রয়-বিক্রয় সিদ্ধান্তে উর্বরতা একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্ণায়ক। একাধিক জমি খন্ড থাকলে কৃষক সবচেয়ে অনুর্বর জমিটিই আগে বিক্রির সিদ্ধান্ত নেন। ফোকাস গ্রুপ আলোচনায় ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকেরা পত্তনি চাষের ফলে অনুর্বর জমির বিক্রির ঘটনার উল্লেখ করেছেন। অনুর্বর জমির সেই ক্রেতাও ক্রয়কৃত জমিটি কৃষি কাজে ব্যবহার না করে এক সময় সেই জমিটি অ-কৃষি কাজে ব্যবহার করে।

[১০] জেলাগুলো হলো: লালমনিরহাট-৩,০৮,২৩৯ একর; চুয়াডাঙ্গা-২,৯০,১২৬ একর; শরিয়তপুর-২,৯০,১২৬ একর; নরসিংদী-২,৮৪,১৯৬ একর; মাদারিপুর-২,৭৮,১৬৭ একর; রাজবাড়ি-২,৬৯,৯১৩ একর; মাগুরা-২,৫৬,৭৬৭ একর; জয়পুরহাট-২,৫০,১৬৯ একর; মুন্সিগঞ্জ-২,৪৮,১৬৮ একর; ফেনী-২,৪৪,৭৩৩ একর; নড়াইল-২,৩৯,১৯৮ একর; মেহেরপুর-১,৮৫,৭২৪ একর; ঝালকাঠি-১,৭৪,৬৫৪ একর; নারায়ণগঞ্জ-১,৬৯,১১৮ একর।

গ্রাম বাংলায় জমি ক্রয়-বিক্রয়ের বাজার মন্থর। বছরে ২ শতাংশের কম (১.৭২%) গ্রামীণ খানা জমি বিক্রি করে (বারকাত প্রমুখ, ২০১৭)। জমি ক্রয়-বিক্রয়ের সিদ্ধান্তে খানা, খানা প্রধান ও খানা সদস্যদের বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক-জনমিতিক বৈশিষ্ট্যের ভূমিকার প্রমাণ পাওয়া গেলেও খানার পত্তনি প্রথায় অংশগ্রহণ এবং এর ফলে জমির উর্বরতাহানির ভূমিকা নিয়ে গবেষণা বাংলাদেশে এখনো হয়নি।

২.৭ পত্তনি চাষের ফলে কৃষকের কৃষি কাজ ত্যাগ

ফলন ভাল হলে পত্তনি জমির খাজনার হার বেড়ে যায়। ক্রমবর্ধমান ভূমিহীনতা এবং ক্রমহ্রাসমান বর্গা প্রথাও পত্তনিতে জমি নেয়ার প্রতিযোগিতা এবং খাজনার হার বাড়িয়ে দেয়। উচ্চ খাজনা প্রদানের আর্থিক অক্ষমতা এবং প্রতিযোগিতায় টিকতে না পারায় ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিদের পত্তনি জমিতে অভিগম্যতা সংকুচিত হয় এবং তারা চাষাবাদ ছাড়তে বাধ্য হয়।

পত্তনি চাষের উচ্চ ও অতিরিক্ত উপকরণ খরচ কৃষকদের ঋণগ্রস্ত করে; প্রাকৃতিক দুর্যোগসহ অন্যান্য কারণে ফসলহানি ঘটলে আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয় কৃষকেরা। বর্তমান গবেষণায় পত্তনি চাষের ফলে বিগত ১০ বছরে খানা প্রতি মোট আর্থিক ক্ষতি ও ঋণগ্রস্ততার একটি হিসেব করা হয়েছে (সারণি ৭)। ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিরা আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ও ঋণগ্রস্ত হয়ে পত্তনি চাষ ছেড়ে অ-কৃষি খাতে চলে যাচ্ছে, শহরমুখী হচ্ছে।

সারণি ৭: পত্তনি চাষের ফলে বিগত ১০ বছরে খানা প্রতি মোট আর্থিক ক্ষতি ও ঋণগ্রস্ততা (টাকা)			
	আর্থিক ক্ষতি (টাকা)	ঋণগ্রস্ততা (টাকা)	মোট আর্থিক ক্ষতি ও ঋণগ্রস্ততা (টাকা)
রংপুর	১৯,৪০০	২১,৪০০	৪০,৮০০
গাইবান্ধা	১৬,৬৭৩	১৬,৫৭১	৩৩,২৪৪

২.৮ পত্তনি চাষের ফলে বাজার নির্ভর খাদ্য নিরাপত্তা

খানা পর্যায়ে খাদ্য নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট খানার খাদ্য প্রাপ্যতা, খাদ্য কেনার সামর্থ্য এবং খাদ্য থেকে প্রয়োজনীয় পুষ্টি প্রাপ্তির উপর নির্ভর করে (বিদিশা প্রমুখ, ২০১৭)। পত্তনি চাষে জড়িত খানা, খাদ্য নিরাপত্তার প্রথম শর্ত অর্থাৎ খাদ্য প্রাপ্যতার ক্ষেত্রে একাধিক দিক থেকে সংকটের মুখে পড়ে এবং খাদ্য প্রাপ্তির জন্য বাজারনির্ভর হয়ে পড়ে।

- পত্তনি প্রথায় জমির মালিককে অগ্রিম খাজনা প্রদান, কৃষকের উৎপাদনে বিনিয়োগের পরিমাণ বা সক্ষমতা কমিয়ে দেয়। এর ফলে মোট উৎপাদন কম হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সম্ভাব্য উৎপাদন হ্রাস এড়ানো গেলে কৃষক তার গৃহস্থালি খানার চাহিদা মেটাতে ঐ অনুপাতে কম বাজার নির্ভর হতো।

- অনেক ক্ষুদ্র, প্রান্তিক ও দরিদ্র চাষিই অগ্রিম টাকা দিয়ে জমি চাষ করতে পারে না। চাষাবাদ ছেড়ে দিয়ে তারা গার্মেন্টস, রিক্সা বা অ-কৃষি দিন মজুর হিসেবে কাজ করে। এতে তাদের আয়-রোজগার হয়তো একই থাকে অথবা কিছুটা বাড়ে; কিন্তু চাল, ডাল, সবজি প্রভৃতির জন্য বাজার নির্ভর হতে হয়।

- আগে যে জমিতে ধান হত, এখন পত্তনি নেয়া সেই জমিতে সবজি চাষ হয়, এতে চালের জন্য খানাটিকে বাজারমুখী হতে হয়। আবার কেউ কেউ হয়তো পত্তনি নেয়া জমিতে কেবল ধানই চাষ করে। তাদের আবার সবজি ও অন্যান্য শস্যের জন্য বাজার নির্ভর হতে হয়।

অনুর্বর জমিতে ক্রমশ আগের তুলনায় কম খাদ্যশস্য উৎপাদিত হয়। উৎপাদন একই পর্যায়ে রাখতে বা বাড়াতে চাইলে উপকরণ খরচ বেড়ে মুনাফার মার্জিন পরিমাণ কমে; কৃষকের প্রকৃত আয় বা ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পায়। ক্রয়ক্ষমতা হ্রাসের জন্য কর্মশালা ও এফজিডি-তে অংশগ্রহণকারী কৃষকরা ফসলহানিজনিত আর্থিক ক্ষতি ও ঋণগ্রস্ততার উল্লেখ করেছেন। খাদ্য কেনার সামর্থ্যের ঘাটতি খানার খাদ্য নিরাপত্তাকে দারুনভাবে প্রভাবিত করে।

মুনাফার তাড়নায় এবং ঋণ পরিশোধসহ নানা জীবিকা চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি পত্তনি চাষি প্রায়শই অনিরাপদ খাদ্য উৎপাদন করে। নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনের কাজটি প্রাণ ও প্রকৃতির প্রতি সংবেদনশীলতার সাথে সম্পর্কিত। এজন্য জমির ধরন বুঝে বীজ বোনা, সেচ ও নিড়ানি দেয়া থেকে শুরু করে ফসল কাটা, বাজারজাত করা পর্যন্ত চাষিকে ভোক্তার স্বার্থ সম্পর্কে সচেতন থাকতে হয়। যেমন

কীটনাশক প্রয়োগের পর একটি নিদিষ্ট সময় অন্তর ফসল তুলতে হয়, না হলে ফসলের গায়ে বিষ রয়ে যায়, যা মানবস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। কর্মশালা ও এফজিডি থেকে জানা যায়, দ্রুত বিক্রি করে নগদ প্রাপ্তির আশায় পত্তনি চাষিদের মাঝে নিদিষ্ট সময়ের আগেই ফসল তুলে ফেলার প্রবণতা দেখা যায়।

২.৯ পত্তনি চাষের ফলে কৃষিতে নারীর কর্ম-সংকোচন

বর্তমান গবেষণায় অন্ততপক্ষে ৯টি কৃষিজ কর্মকাণ্ডকে (যেমন, বীজ বপণ, আগাছা পরিষ্কার, ফসল তোলা বা কাটা, শস্য মাড়াই. ফসল অথবা উপজাত শুকানো, ফসল বাড়িতে নিয়ে যাওয়া, ফসল সংরক্ষণ, বীজ সংরক্ষণ এবং শস্য বিক্রি) চিহ্নিত করা হয়েছে, যেখানে পত্তনি চাষের ফলে কৃষিকাজে নারীর ভূমিকা সংকুচিত হয়ে এসেছে (সারণি ৮)। কাজের সংকোচনের মাত্রা ০.৭ শতাংশ (ফসল বাড়িতে নিয়ে যেতে) থেকে ২৯.৩ শতাংশ (বীজ সংরক্ষণে)।

নারীরা অতীতে বীজ সংরক্ষণে ব্যাপকভাবে যুক্ত ছিলেন (৫৩.৮%), যা পত্তনি প্রথায় চাষপদ্ধতিতে যুক্ত হওয়ার পর ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে (২৪.৫%)। এর জন্য অংশত বীজের কর্পোরেটায়নও দায়ী, যা প্রচলিত পদ্ধতিতে বীজ সংরক্ষণ করাকে অপ্রয়োজনীয় করে তোলে। অর্থাৎ ফলন বৃদ্ধির তাগিদে বিজ্ঞাপনের মোহে পড়ে কৃষক নানাবিধ বাজারী বীজে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে।

সারণি ৮: পত্তনি চাষের প্রক্রিয়ায় খানার নারীর অংশগ্রহণ [একাধিক উত্তর]

কাজসমূহ	নারীর অংশগ্রহণ (%)	
	পত্তনি চাষে অংশগ্রহণের আগে	পত্তনি চাষে জড়িত থাকার পরে
বীজ বপণে	১৬.৩	১৩.৩
আগাছা পরিষ্কারে	২০.০	১৮.৩
সার প্রয়োগে	০.০	০.০
কীটনাশক প্রয়োগে	০.০	০.০
ফসল তোলায় বা কাটায়	১৫.২	১৩.৯
শস্য মাড়াই	৪১.০	৩৪.৪
শুকানো (ফসল অথবা উপজাত)	৬৯.৭	৬৪.৪
ফসল বাড়িতে নিয়ে যেতে	৮.৯	৮.২
ফসল সংরক্ষণে	৬২.৫	৫১.৬
বীজ সংরক্ষণে	৫৩.৮	২৪.৫
শস্য বিক্রিতে	২.৯	১.০

অধ্যায় ৩
চুক্তিবদ্ধ চাষ

৩.১ ভূমিকা

পত্তনি চাষের তুলনায় চুক্তিবদ্ধ চাষ বাংলাদেশে অপেক্ষাকৃত নতুন। **চুক্তিবদ্ধ চাষ প্রক্রিয়ায় কোম্পানির (এনজিও, অন্য যে কোনো প্রতিষ্ঠান অথবা পাইকারের) 'ইনপুট'[১১] সহায়তায় চাষ করে কৃষক তার উৎপাদিত ফসল পূর্ব নির্ধারিত শর্তে ও দরে কোম্পানির (অথবা উল্লেখিতদের) কাছে বিক্রি করতে বাধ্য থাকে।** চুক্তিবদ্ধ চাষ বলতে কৃষিজ পণ্য এবং কাঁচামালের বাঞ্ছিত মান, পরিমাণ, স্থান এবং সময়মতো সরবরাহ বজায় রাখার সুযোগ পেতে ফার্মগুলোর গৃহীত সরবরাহ-শৃঙ্খল শাসনব্যবস্থার একটা সুনির্দিষ্ট রূপকে বোঝায়। এটা বৈশ্বিক পর্যায়ে কৃষির বাণিজ্যিকীকরণের সাথে সম্পর্কিত।

বিশ্বায়নের সাথে সম্পৃক্ত চুক্তিবদ্ধ চাষ বিশ শতকের অতুলনীয় প্রযুক্তিক বিকাশ। চুক্তিবদ্ধ কৃষি-ব্যবসা ফার্মগুলোর মধ্যস্থতায় স্থানীয় উৎপাদকদেরকে বৈশ্বিক খদ্দেরদের সাথে যুক্ত করেছে। চুক্তিবদ্ধ চাষ সেইসব উৎপাদকের জন্য বিশ্ব বাজারকে উন্মুক্ত করেছে যারা এতোদিন স্থানীয় বাজারের জন্য কাজ করছিলেন। এধরনের চাষ কৃষকের ঝুঁকি কমায়, এবং তা বাহ্যত আর্থিকভাবে লাভজনক। তবে এই আর্থিক লাভের বিনিময়ে, কৃষকদেরকে তাদের পেশাগত স্বাধীনতা সীমিত করতে হয়।

চুক্তিবদ্ধ চাষ কোনো অবিমিশ্র আশীর্বাদ নয়। নানাবিধ সুযোগ-সুবিধা বয়ে আনার পাশাপাশি এধরনের চাষ পদ্ধতি কিছু সমস্যাও সৃষ্টি করেছে। চুক্তিবদ্ধ চাষ কৃষকের স্বাধীনতা খর্ব করে, যেহেতু চাষপদ্ধতি কনট্রাক্ট ফার্ম কর্তৃক নির্দেশিত হয়, এবং কৃষক তাদের কথা শুনতে বাধ্য থাকে। চুক্তিবদ্ধ তামাক চাষের ফলে স্বাস্থ্যের অবক্ষয় হয় এবং দীর্ঘমেয়াদে মাটির উর্বরতা হ্রাস পায়। তাছাড়া, এধরনের চাষ পদ্ধতি খানাগুলোকে অতিমাত্রায় বাজারনির্ভর করে তোলার মাধ্যমে তাদের খাদ্য নিরাপত্তা হুমকির মুখে ফেলে, এবং চাষদ্রব্যের বাইরেও চুক্তিবদ্ধ চাষের ওপর তাদের নির্ভরশীলতার কারণে কৃষকরা তাদের দরকষাকষির ক্ষমতা হারিয়ে ফেলতে পারে।

আরো কিছু সুনির্দিষ্ট সমস্যাসহ চুক্তিবদ্ধ চাষের উল্লেখিত সীমাবদ্ধতা এই অধ্যায়ের অনুসন্ধানের বিষয়বস্তু, যার দৃষ্টান্ত নেয়া হয়েছে বাস্তবতা থেকে।

৩.২ চুক্তিবদ্ধ চাষে খানার অংশগ্রহণের মাত্রা

গত দেড় দশকেরও বেশি সময় ধরে রংপুরের পীরগঞ্জ ও গাইবান্ধার সাঘাটায় চুক্তিবদ্ধ চাষ চালু রয়েছে। ফোকাস গ্রুপ আলোচনার (এফজিডি) তথ্যানুযায়ী, বর্তমানে সাঘাটার তুলনায় পীরগঞ্জে চুক্তিবদ্ধ চাষের প্রসার বেশি; পীরগঞ্জে প্রায় ১৫ শতাংশ খানা চুক্তিবদ্ধ চাষের সাথে জড়িত থাকলেও সাঘাটায় ৫ শতাংশ খানা এই ধরনের চাষের সাথে জড়িত। অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে পরিস্থিতি পত্তনি চাষের উল্টো, যেখানে পীরগঞ্জের চেয়ে সাঘাটার কৃষি খানাগুলোর অংশগ্রহণ বেশি (দেখুন অনুচ্ছেদ ২.২)।

পীরগঞ্জ ও সাঘাটার সংশ্লিষ্ট উপাত্ত ব্যবহার করে সারণি ৯-এ রংপুর, গাইবান্ধা ও সমগ্র বাংলাদেশে 'চুক্তিবদ্ধ চাষ' -এর সাথে জড়িত সম্ভাব্য খানার সংখ্যা এবং খানার সদস্য সংখ্যা নিরূপণ করা হয়েছে[১২]।

---

[১১] 'Input' বা উৎপাদন উপকরণের অন্তর্ভূক্ত হলো বিভিন্ন যান্ত্রিক ও অ-যান্ত্রিক, রাসায়নিক ও অ-রাসায়নিক কৃষি উপকরণ, যেমন- সার, বীজ, কীটনাশক, বালাইনাশক, সেচ প্রভৃতি।

[১২] বিস্তারিত হিসাব পদ্ধতি গবেষণা প্রতিবেদনের প্রথম অধ্যায়ে বর্ণিত গবেষণা পদ্ধতিতে উল্লেখ করা আছে। দেখুন: Box 1.1, Section 1.3, Present Form and Disempowerment Process of the Rural Peasants: A Case Study on Two Northern Upazilas. Dhaka: HDRC & Nijera Kori, 2018.

সারণি ৯: চুক্তিবদ্ধ চাষের সাথে জড়িত সম্ভাব্য খানা এবং খানার সদস্য সংখ্যা		
	সম্ভাব্য খানার সংখ্যা	সম্ভাব্য খানার সদস্য সংখ্যা
রংপুর	৫৩,৩৪৫	৪,১০,৭৫৭
গাইবান্ধা	১৬,৩৩৯	৮১,৬৯৫
বাংলাদেশ	১৫,১৮,৩১৮	৬২,৪০,২৮৭

চুক্তিবদ্ধ চাষি খানার গড় আকার (৪.৯), পত্তনি চাষি খানার গড় আকারের চেয়ে বেশি – যা গ্রামীণ খানার জাতীয় গড়ের (৪.১) চেয়ে বেশ কিছুটা বেশি। খানার আকার সর্বোচ্চ ১০ থেকে সর্বনিম্ন ২; ৮৩.৩ শতাংশ খানার আকার ৪ অথবা ৪ এর চেয়ে বেশি। পীরগঞ্জের চুক্তিবদ্ধ চাষি খানাগুলোর গড় আকার (৭.৭), সাঘাটার খানাগুলোর গড় আকারের (৫.০) চেয়ে বেশি।

পত্তনি চাষের তুলনায় চুক্তিবদ্ধ চাষে নারী প্রধান খানার অংশগ্রহণ কম মনে হয়। এ ধরনের চাষি খানাগুলোর মাত্র ৫ শতাংশ নারী প্রধান খানা।

কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর বিবেচনায় পত্তনি চাষি খানার তুলনায় চুক্তিবদ্ধ চাষি খানাগুলোর এগিয়ে থাকার প্রমাণ পাওয়া যায় খানা জরিপ থেকে। এসব খানার প্রায় ৬৬ শতাংশ সদস্যের বয়স ১৬ থেকে ৬০ বছর, যারা কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর অংশ।

পত্তনি চাষে যেখানে প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র খানার প্রাধান্য, চুক্তিবদ্ধ চাষে সেখানে মাঝারি ও ক্ষুদ্র খানার প্রাধান্য। গড়ে প্রতিটি চুক্তিবদ্ধ চাষি খানা প্রায় ১৮৩ শতক জমির (প্রায় ১৬০ শতক কৃষি জমিসহ) মালিক, অর্থাৎ বেশিরভাগই মাঝারি ও ক্ষুদ্র খানা।

৭৫ শতাংশ খানাই নিজের জমিতে চুক্তিবদ্ধ চাষ করে (সারণি ১০)। অবশিষ্ট এক-চতুর্থাংশ খানার একটি অংশ নিজের জমির পাশাপাশি অন্যের জমি নিয়ে চুক্তিবদ্ধ চাষে জড়িত হয়, এর পাশাপাশি ফোকাস গ্রুপ আলোচনায় আরো এক দল খানার সম্পর্কে জানা যায় যারা চুক্তিবদ্ধ চাষের পুরোটাই করে অন্যের জমিতে। বড় (৬.৭%) এবং মাঝারি (১৫%) খানাগুলো থেকে চুক্তিবদ্ধ চাষের জমির সরবরাহের এক-পঞ্চমাংশ আসে।

সারণি ১০: চুক্তিবদ্ধ চাষের জন্য খানাগুলো যাদের কাছ থেকে জমি ইজারা নিয়েছে (%)	
ভূমি মালিকানার ধরনসমূহ	খানা
নিজস্ব জমি	৭৫.০
মাঝারি কৃষি খানা	১৫.০
বড় কৃষি খানা	৬.৭
অনুপস্থিত জমির মালিক	১.৭
কর্পোরেট প্রতিষ্ঠান	১.৭

পত্তনি চাষের মত চুক্তিবদ্ধ চাষও এমন কিছু খানাকে চাষাবাদে নিয়ে এসেছে, যারা পূর্বে কৃষির সাথে জড়িত ছিল না; যদিও তাদের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম। চুক্তিবদ্ধ চাষে জড়িত এমন প্রায় ১.৭ শতাংশ খানা আগে চাষাবাদের সাথে জড়িত ছিল না।

দেড় দশকেরও বেশি সময় ধরে পীরগঞ্জ ও সাঘাটায় চুক্তিবদ্ধ চাষাবাদের প্রচলন থাকলেও, খানা জরিপের উপাত্ত বিশ্লেষণে দেখা যায়, গড়ে প্রায় ৪ বছর ধরে খানাগুলো চুক্তিবদ্ধ চাষাবাদে জড়িত রয়েছে। পত্তনি চাষের মতই স্থানীয় পর্যায়ের কর্মশালার তথ্য থেকে এই দ্বৈত পর্যবেক্ষণের একটি ব্যাখ্যা পাওয়া যায় – কিছু খানা বেশ কয়েক বছর চুক্তিবদ্ধ চাষাবাদে জড়িত থাকলেও বেশিরভাগ খানাই সম্প্রতি এ ধরনের চাষাবাদে যুক্ত হয়েছে।

সর্বশেষ বছরে (২০১৭ সালে) খানাগুলো গড়ে প্রায় ৬৪ শতক জমিতে চুক্তিবদ্ধ চাষ করেছে; শুরুর বছরে (যখন খানাগুলো চুক্তিবদ্ধ চাষ শুরু করেছিল) চুক্তিবদ্ধ চাষের আওতায় খানাগুলোর গড় জমির পরিমাণ ছিল প্রায় ৫৪ শতক। চুক্তিবদ্ধ চাষি খানাগুলোর ক্ষেত্রে ৪ বছরে জমির গড় নিয়োজন ১০ শতক বেড়েছে।

এক-পঞ্চমাংশ খানার ক্ষেত্রে চুক্তিবদ্ধ চাষে জমির নিয়োজন বেড়েছে (সারণি ১১)। জমি ছাড়াও গৃহস্থ শ্রম, ভাড়া করা শ্রম এবং খানার অন্যান্য সম্পদের ক্ষেত্রে নিয়োজন বেড়েছে। দুই-তৃতীয়াংশের বেশি খানা চুক্তিবদ্ধ চাষের ক্ষেত্রে বহিঃস্থ শ্রমশক্তির নিয়োজন বাড়িয়েছে এবং অর্ধেকের বেশি খানা কৃষি যন্ত্রপাতিসহ অন্যান্য সম্পদের নিয়োজন বাড়িয়েছে।

সারণি ১১: 'চুক্তিবদ্ধ চাষ'-এর ক্ষেত্রে খানার সম্পদ নিয়োজনের পরিবর্তন (%)			
সম্পদ	খানার সম্পদ নিয়োজন		
	বেড়েছে	কমেছে	অপরিবর্তিত
খানার শ্রম শক্তি	৩৩.৩	৮.৩	৫৮.৩
খানা-বহির্ভূত শ্রম শক্তি	৭০.০	১১.৭	১৮.৩
জমি	২০.০	১১.৭	৬৮.৩
অন্যান্য সম্পদ	৫৩.৩	৮.৩	৩৮.৩

বাংলাদেশে বহুদিন ধরেই কোম্পানিগুলো তামাক, আখসহ কিছু নির্দিষ্ট পণ্যের চাষিদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়ে কাজ করছে। ইদানিং এ ধরনের চাষ প্রক্রিয়ায় জোরেশোরে প্রবেশ করছে দেশের উদীয়মান চেইন শপ স্বপ্ন, আগোরা, মীনাবাজার প্রভৃতি কোম্পানি। তারা ফল, শাক, সবজি, মসলাসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যশস্যের জন্য চাষিদের চুক্তিবদ্ধ করছে। খানা জরিপ, ফোকাস গ্রুপ আলোচনা ও স্থানীয় পর্যায়ের কর্মশালার তথ্যানুযায়ী, আখ (মূলত সাঘাটায়) ও সয়াবিন (মূলত পীরগঞ্জে) ছাড়াও গবেষণাধীন উপজেলা দুটিতে তামাক, ধান, আলু এবং সবজির ক্ষেত্রে চুক্তিবদ্ধ চাষের প্রচলন রয়েছে।

৩.৩ চুক্তিবদ্ধ চাষের বিবর্তনের কারণসমূহ

সারা বিশ্বব্যাপী চুক্তিবদ্ধ চাষ প্রক্রিয়ায় কোম্পানির এবং কৃষি খানার অংশগ্রহণ বাড়ছে। কোম্পানির (অথবা এনজিও, অথবা অন্য যে কোন প্রতিষ্ঠান অথবা পাইকারের) অংশগ্রহণের হার বেড়ে যাচ্ছে মূলত চুক্তিবদ্ধ চাষের ব্যায়সাশ্রয়ী, নিয়মিত সরবরাহ নিশ্চিতকরণ সহায়ক নিম্নবর্ণিত কিছু সুনির্দিষ্ট কারণে (দ্য সিলভা, ২০০৫)।

- ✓ নির্ধারিত দামে, নির্ধারিত সময়ে, নির্ধারিত পণ্য পাওয়ার নিশ্চয়তায় চুক্তিবদ্ধ চাষে ব্যয় সাশ্রয় ঘটে;
- ✓ প্রক্রিয়াজাতকরণ সক্ষমতার এবং বিতরণ অবকাঠামোর কাম্য ব্যবহার হয়;
- ✓ ভোক্তার চাহিদার সাথে পণ্য সরবরাহের কার্যকর সমন্বয় সাধন সম্ভব হয়;
- ✓ সর্বোচ্চ পর্যায়ে পণ্যের কাঙ্ক্ষিত 'গুণগত মান' এবং 'নিরাপত্তা স্ট্যান্ডার্ড'- এর অর্জন সম্ভব হয়;
- ✓ বড় আকারের ভূমি ব্যবহারের আইনগত ও দামগত বাধা অপসারণ করে;
- ✓ অধিক দর কষাকষির ক্ষমতা, পাইকারী ক্রয়, সাশ্রয়ী পরিবহন খরচ এবং সুবিধাজনক অর্থায়নের সুযোগ ইউনিট প্রতি উপকরণ খরচ কমায়;
- ✓ সরবরাহ-শৃঙ্খলে ঝুঁকি হ্রাস এবং মাত্রাগত ব্যয় সংকোচন অর্জনের নিশ্চয়তা সুবিধাজনক আর্থিক অভিগম্যতার সুযোগ করে দেয়;
- ✓ সরকারি প্রণোদনা ও ভর্তুকি প্রাপ্তি;
- ✓ উৎপাদন ক্ষেত্রে শ্রম আইন মেনে শ্রমিক নিয়োগ করতে হয় না বলে শ্রম খরচ কম হয়; এবং
- ✓ উৎপাদন সম্প্রসারণ বা সঙ্কোচনের সুবিধা।

বারকাত, সোহ্‌রাওয়ার্দী এবং ওসমান (২০১৫) এর গবেষণায় দেখা গেছে, চুক্তিবদ্ধ চাষের পেছনে মূল চালিকাশক্তি হচ্ছে বাণিজ্যিক স্বার্থ; এছাড়াও অন্যান্য চালিকাশক্তি হলো - খানার আয় বাড়ানো (৪১%), ক্ষুদ্র বিনিয়োগে লাভ তুলে আনা (৩৮%) এবং মূল্য নিশ্চিত থাকায় ক্ষতির আশঙ্কা থেকে মুক্তি পাওয়া (১৭.৫%)। ১৬ শতাংশ খানা বলেছে মানসম্মত বীজ নিশ্চিত করতে এবং উন্নত চাষ পদ্ধতির ফলে ভালো ফলন পাওয়ায় তারা চুক্তিবদ্ধ চাষ করে। ১২ শতাংশ খানা জানিয়েছে তাদের আর কোনো বিকল্প নেই।

বর্তমান গবেষণায় পীরগঞ্জ ও সাঘাটার খানা জরিপ থেকে দেখা যায়, চুক্তিবদ্ধ চাষে ক্রমবর্ধমান খানা অংশগ্রহণের পেছনে সবচেয়ে জনপ্রিয় কারণ হচ্ছে উৎপাদন উপকরণ সরবরাহ (৪৪.১%), যার পরেই রয়েছে মুনাফা অর্জন (২৩.৭%) এবং বিক্রয় নিরাপত্তা

(২০.৩%)। মাত্র ১.৭ শতাংশ খানা আর্থিক স্বচ্ছলতার অভাবকে চুক্তিবদ্ধ চাষে অংশগ্রহণের কারণ হিসেবে বর্ণনা করেছে (সারণি ১২)।

কৃষি উপকরণের ক্রমবর্ধমান দাম এবং অবনতিশীল মান কৃষি উৎপাদনকে নাজুক অবস্থায় রাখে, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষককে ব্যতিব্যস্ত রাখে লাভ-লোকসানের খেরোখাতা মেলাতে। মানসম্মত উপকরণ সহায়তা তাই এ ধরনের কৃষককে চুক্তিবদ্ধ চাষে সহজেই আকৃষ্ট করে। তবে কৃষকরা ফোকাস গ্রুপ আলোচনা ও কর্মশালায় কোম্পানি প্রদত্ত কৃষি উপকরণের বাজার দামের চেয়ে বেশি দাম রাখার সমালোচনা করেছেন।

গরিব কৃষকদের মধ্যে চুক্তিবদ্ধ চাষ জনপ্রিয় হচ্ছে না; এফজিডি ও কর্মশালার তথ্যানুযায়ী, এই চাষ পদ্ধতি আকর্ষণ করছে সেইসব কৃষককে, ইতোমধ্যেই যাদের হাতে কিছু জমি আছে এবং যে কারণে তারা নিছক টিকে থাকার চেয়ে বেশি কিছু ভাবতে সক্ষম। এটা কৃষকদের সেই অংশটাকে যুক্ত করে যারা বাজারে বিক্রয় নিশ্চিত করা (২০.৩ শতাংশ খানা) বা মুনাফা অর্জনের (২৩.৭ শতাংশ খানা) মতো মাধ্যমিক বিষয়াশয় নিয়ে ভাবতে পারে। নগদ টাকা আর উচ্চ মূল্যের আকর্ষণীয় প্রস্তাব (২০.৩ শতাংশ খানা), ঋণ সুবিধা (২০.৩ শতাংশ খানা) প্রভৃতিও আর্থিক সংকটে থাকা প্রান্তিক কৃষি খানাকে চুক্তিবদ্ধ চাষে উৎসাহী করে।

সারণি ১২: খানাগুলোর চুক্তিবদ্ধ চাষে জড়িত থাকার পিছনে প্রধান কারণসমূহ [একাধিক উত্তর] (%)

প্রধান প্রধান কারণ	খানা
উপকরণ সহায়তা	৪৪.১
আরো বেশী লাভের জন্য	২৩.৭
বিক্রয়ের নিশ্চয়তা	২০.৩
চুক্তিবদ্ধ কোম্পানির আকর্ষণীয় প্রস্তাব	১৫.৩
ঋণ সুবিধা	১০.২
এই জমি শুধু এই ফসল উৎপাদনের জন্যই উপযুক্ত	৮.৫
চুক্তির ফসলের পরে অন্য ফসল উৎপাদন করতে পারবে	৬.৮
জমির মালিকের চাপ	১.৭
অন্যান্য ফসল চাষে ক্ষতির জন্য	১.৭
ফসল চাষের জন্য অর্থনৈতিক সচ্ছলতার অভাব	১.৭
ভর্তুকি	১.৭

৩.৪ চুক্তিবদ্ধ চাষের ফলে কৃষির ওপর কৃষকের অধিকার, স্বাতন্ত্র্য এবং নিয়ন্ত্রণ হ্রাস

অর্ধেকের বেশি (৫৬.৪%) চুক্তিবদ্ধ চাষি খানা মনে করেন, এধরনের চাষের ফলে তারা ইতোমধ্যেই ভূমিসহ কৃষি উৎপাদনের উপর অধিকার হারিয়েছেন। চুক্তিবদ্ধ কৃষক এবং কোম্পানি বা চুক্তি-সম্পাদনকারী দ্বিতীয় পক্ষের মধ্যকার অসম সম্পর্ক (uneven relationship) কৃষির ওপর কৃষকের অধিকার বা নিয়ন্ত্রণ হ্রাসের মূল কারণ। দ্বিতীয় পক্ষ প্রায়শই ক্ষমতা ও প্রতিযোগিতা-বিরুদ্ধ চর্চা করে বিনিময় শর্ত কৃষকের প্রতিকূলে নিয়ে যায়। বেশির ভাগ কৃষি খানাই চুক্তিপত্র পড়ে না, যারা পড়ে তারাও চুক্তির বেশিরভাগ শর্তই বোঝে না। শস্য নির্বাচন, উপকরণ চয়ন ও প্রয়োগ থেকে শুরু করে ফসল কাটা অব্দি উৎপাদনের বিভিন্ন ধাপ চুক্তির শর্তাধীন হয়। যত বেশি ধাপ চুক্তির শর্তাধীন হয়, তত বেশি হারে উৎপাদনের উপর কৃষকের নিয়ন্ত্রণ কমে। ফোকাস গ্রুপ আলোচনা ও কর্মশালায় কৃষকরা নিজেদের ইচ্ছা অনুযায়ী ফসল বপন করতে ও কাটতে না পারার ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

চুক্তিবদ্ধ চাষে কৃষকদের প্রায়শই বীজ, সার, কীটনাশক প্রভৃতি কৃষি উপকরণ বাজারের চেয়ে বেশি দামে কোম্পানির কাছ থেকে কিনতে বাধ্য করা হয়। ক্ষেতে কৃষি উপকরণ প্রয়োগের পরিমাণ, সময় প্রভৃতির ওপর কৃষকের কোন নিয়ন্ত্রণ থাকে না। ফসল কি পরিমাণ রোদে শুকোবে তাও কোম্পানি নির্ধারণ করে দেয়। গ্রেডিং ও নানা গুণগত মানের দোহাই দিয়ে কৃষকের কষ্টার্জিত উৎপাদনের একটি অংশ প্রায়ই প্রত্যাখ্যাত হয়; সেই পণ্য কম দামে চাষিদের বাজারে বিক্রি করতে হয়। আবার বাজারে ফসলের বেশি দাম থাকলেও, নির্দিষ্ট দামে কোম্পানির কাছে তা বিক্রি করতে বাধ্য হয়।

পীরগঞ্জ ও সাঘাটার খানা পর্যায়ের উপাত্ত ব্যবহার করে হিসেব করা যায় যে, ৭১.৭ শতাংশ খানা অর্থাৎ দেশের প্রায় ১১ লক্ষ চুক্তিবদ্ধ চাষি খানা বা প্রায় ৪৫ লক্ষ মানুষ ইতিমধ্যেই জমির উর্বরতা হ্রাস, ঋণগ্রস্ততা ও আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে।

বারকাত, সোহরাওয়ার্দী এবং ওসমানের (২০১৫) মতে, দীর্ঘমেয়াদে চুক্তিবদ্ধ চাষ কৃষকদের ভেতরে সুযোগসুবিধার অসমতা সৃষ্টি করে যা তাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের জন্য প্রতিকূল পরিস্থিতি তৈরি করে। এটা চুক্তিবদ্ধ চাষের নৈতিকতাকেই প্রশ্নবিদ্ধ করে। যে কেউ ভাবতেই পারেন, এই ধরণের চাষ পদ্ধতির উদ্দেশ্য আসলে কি কৃষকদের উন্নতিসাধন, নাকি এটা শুধু শোষনেরই আরেকটা পদ্ধতি যা ভূমি ও কৃষি ক্ষেত্রে কৃষকদের অধিকার ব্যাপকভাবে খর্ব করে।

৩.৫ চুক্তিবদ্ধ চাষের ফলে জমির উর্বরতা হ্রাস

চুক্তিবদ্ধ চাষের আওতায় পীরগঞ্জের চাষিরা দীর্ঘদিন ধরে তামাক চাষ করেছে। দীর্ঘ দিনের তামাক চাষ জমির স্বাভাবিক উর্বরতা নষ্ট করে, মাটিতে ক্ষতিকর উপকরণের পরিমাণ বাড়ায়, অধিক হারে মাটির পুষ্টি উপাদান বিনষ্ট করে। শস্যাবর্তনের অনুপস্থিতি অর্থাৎ একই শস্যের বারবার চাষ, উর্বরতার স্বাভাবিক অর্জনকে বাধাগ্রস্ত করে।

ফোকাস গ্রুপ আলোচনা ও কর্মশালা থেকে প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায়, চুক্তিবদ্ধ চাষিরা জমির উৎপাদিকা শক্তি ধরে রাখতে উত্তোরত্তর রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের ব্যবহার বাড়িয়ে চুক্তিবদ্ধ চাষের জমিটিকে আরো অনুর্বরতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। তাদের মধ্যে জৈব সার, যেমন ভার্মি কম্পোস্ট বা কেঁচো সার ব্যবহারের প্রবণতা নেই বললেই চলে।

বক্স ২: রাসায়নিক সার ক্রমেই ভূমির উর্বরতা বিনষ্ট করছে!
উর্বর মাটিতে ৫ শতাংশ জৈব পদার্থ থাকার কথা। এতে মাটিতে পানির ধারণক্ষমতা ও বায়ু চলাচলের সুযোগ বাড়ে। কিন্তু দেশের বেশির ভাগ এলাকায় মাটিতে জৈব পদার্থের পরিমাণ মাত্র ১ শতাংশ। তাই মাটিতে জৈব সারের ব্যবহার বাড়ালে মাটির প্রাকৃতিক উর্বরতা বাড়বে। জৈব সার মাটিকে নরম করে ও বিভিন্ন অনুজীবের বসবাসের পরিবেশ সৃষ্টি করে। অন্যদিকে রাসায়নিক সার ব্যবহার করলে ক্রমেই ভূমির প্রাকৃতিক উর্বরতা কমে যেতে থাকে। উৎস: মৃধা (২০১৯)

বর্তমান গবেষণায় দেখা যাচ্ছে, বিগত দশ বছরে চুক্তিবদ্ধ চাষের ফলে পীরগঞ্জ ও সাঘাটায় বেশ কিছু পরিমাণ কৃষি জমি অনুর্বর হয়ে পড়েছে; খানা প্রতি গড় অনুর্বর জমির পরিমাণ পীরগঞ্জের (৭.২ শতক) চেয়ে সাঘাটায় বেশি (১৪ শতক)। পীরগঞ্জ ও সাঘাটার এই খানা-ভিত্তিক উপাত্ত ব্যবহার করে হিসেব করা যায় যে, চুক্তিবদ্ধ চাষের ফলে রংপুরে এবং গাইবান্ধায় সম্ভাব্য মোট অনুর্বর জমির পরিমাণ যথাক্রমে ৩,৮৪১ এবং ২,২৮৭ একর (সারণি ১৩)।

সারণি ১৩: চুক্তিবদ্ধ চাষের ফলে অনুর্বর জমি

	খানা প্রতি গড় অনুর্বর জমি (শতক)	সম্ভাব্য মোট খানার সংখ্যা	সম্ভাব্য মোট অনুর্বর জমির পরিমাণ (একর)
রংপুর	৭.২	৫৩,৩৪৫	৩,৮৪০.৮৪
গাইবান্ধা	১৪	১৬,৩৩৯	২,২৮৭.৪৬
বাংলাদেশ	১০.৭	১৫,১৮,৩১৮	১,৬২,৪৬০

চুক্তিবদ্ধ চাষের ফলে বাংলাদেশের মোট কৃষিজমির (২২২ লাখ একর) ০.৭৩ শতাংশ বিভিন্ন মাত্রায় অনুর্বর হয়ে পড়েছে, যার পরিমাণ প্রায় ১ লক্ষ ৬২ হাজার একর বা ৪ লক্ষ ৮৬ হাজার বিঘা; যা নারায়ণগঞ্জের মোট আয়তনের (১,৬৯,১১৮ একর) প্রায় সমান।

৩.৬ চুক্তিবদ্ধ চাষের ফলে অনুর্বর জমির বিক্রি

পত্তনি চাষের মতই, চুক্তিবদ্ধ চাষের ফলে অনুর্বর হয়ে যাওয়া জমিরও বিক্রির সম্ভাবনা বেড়ে যায়। ইতোমধ্যেই আলোচনা হয়েছে যে, গ্রামীণ কৃষি খানার জমির ক্রয়-বিক্রয় সিদ্ধান্তে উর্বরতা গুরুত্বপূর্ণ নির্ণায়ক হিসেবে কাজ করে; একাধিক জমি খন্ড থাকলে কৃষক সবচেয়ে অনুর্বর জমিটিই আগে বিক্রি করার সিদ্ধান্ত নেন। ফোকাস গ্রুপ আলোচনায় ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকেরা চুক্তিবদ্ধ চাষের ফলে

অনুর্বর জমির বিক্রির ঘটনার উল্লেখ করেছেন; যে জমি পরবর্তীকালে নতুন ক্রেতা অ-কৃষি কাজে ব্যবহার শুরু করে। প্রতিনিয়ত কৃষি জমি কমে যাওয়ার কঠিন বাস্তবতায়[১৩], পত্তনি চাষের মত চুক্তিবদ্ধ চাষও অবদান (!) রেখে চলেছে।

৩.৭ চুক্তিবদ্ধ চাষের ফলে কৃষকের কৃষি কাজ ত্যাগ

কৃষির বাণিজ্যিকীকরণের (পত্তনি ও চুক্তিবদ্ধ চাষ যার অন্যতম বহিঃপ্রকাশ) অভিঘাত হিসেবে কৃষি জমি অকৃষি খাতে চলে যাওয়ায় চার দশকে (১৯৭২-২০০৯) প্রতিবছর ৪৪ হাজার ২৫৫ জন প্রান্তিক চাষি কৃষিকাজ ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছে (বারকাত, সোহ্‌রাওয়ার্দী এবং ঘোষ, ২০১১)। ইতোমধ্যে পত্তনি চাষের প্রক্রিয়ায় প্রান্তিক চাষির কৃষিকাজ ছেড়ে চলে যাওয়ার বিষয়ে আলোচনা হয়েছে (দেখুন অনুচ্ছেদ ২.৭), একই পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে চুক্তিবদ্ধ চাষের ক্ষেত্রে।

চুক্তিবদ্ধ চাষের ফলে আর্থিক ক্ষয়ক্ষতি ও কর্জে ডুবে গিয়ে, প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষকেরা কৃষিকাজ ছেড়ে দিয়ে অন্যান্য অকৃষি কর্মকাণ্ডে ঝুঁকে পড়ে। সারণি ১৪-তে যেমনটা দেখা যাচ্ছে, গত ১০ বছরে মোট আর্থিক ক্ষতি ও কর্জের পরিমাণ খানা প্রতি রংপুরে ১২,৭৭২ টাকা এবং গাইবান্ধায় ৬৫,৩২৭ টাকা। দরিদ্র ও প্রান্তিক কৃষি খানাগুলোর জন্য, টাকার এই পরিমাণটা বিশাল, যা বহু কৃষককে কৃষিকাজ ছেড়ে দিয়ে অকৃষি কর্মকাণ্ডে যুক্ত হওয়ার দিকে ঠেলে দেয়। পুরো অর্থনীতির ওপরই পড়ে এর বিরূপ প্রভাব।

সারণি ১৪: চুক্তিবদ্ধ চাষের ফলে খানা প্রতি মোট আর্থিক ক্ষতি ও ঋণগ্রস্ততা (টাকা)			
	বিগত ১০ বছরে খানা প্রতি আর্থিক ক্ষতি (টাকা)	বিগত ১০ বছরে খানা প্রতি ঋণিতা (টাকা)	বিগত ১০ বছরে খানা প্রতি মোট আর্থিক ক্ষতি ও ঋণিতা (টাকা)
রংপুর	৭,৭৭২	৫,০০০	১২,৭৭২
গাইবান্ধা	২৮,৪৭০	৩৬,৮৫৭	৬৫,৩২৭

কোন কৃষকই এক বা দুই মৌসুম চাষ করার পর ক্ষতি হওয়ায় আর এই প্রক্রিয়ায় চাষ করেনি। ফোকাস গ্রুপ আলোচনা ও কর্মশালা থেকে প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায়, এই প্রক্রিয়ায় দুর্নীতি চলে ধাপে ধাপে; তাই কোনো কোনো গ্রামের সবাই চুক্তিবদ্ধ চাষ ছেড়ে দিয়েছে। বাংলাদেশ এখনো কোনো শিল্পোন্নত সমাজ নয়। তাই যে কৃষকেরা কৃষিকাজ ছেড়ে শহুরে এলাকায় চলে আসছে তারা শিল্প শ্রমিকে রূপান্তরিত হচ্ছে না। তারা শহর এলাকায় 'টুকিটাকি' কাজ করছে। কাজ করছে অনানুষ্ঠানিক খাতে। তারা অবদান রাখছে বস্তিকরণে, নগরায়নে নয় (বারকাত এবং আখতার, ২০০১)।

৩.৮ চুক্তিবদ্ধ চাষের ফলে বাজার নির্ভর খাদ্য নিরাপত্তা

চুক্তিবদ্ধ চাষ প্রক্রিয়ায় কৃষক অনেক সময়ই খাদ্যশস্য বিশেষত ধান আবাদ বাদ দিয়ে অর্থকরী ফসল চাষে বাধ্য বা উৎসাহিত হয়; ফলে চাল বা অন্যান্য খাদ্যশস্যের জন্য কৃষককে বাজারের মুখাপেক্ষী হতে হয়।

দিনের পর দিন চুক্তিবদ্ধ চাষের ফলে অনুর্বর হয়ে যাওয়া জমিতে পরবর্তীকালে খাদ্য শস্য চাষ করলে কাঙ্ক্ষিত পরিমাণ ফসল পাওয়া যায় না। ফলে খাদ্য নিরাপত্তার প্রাথমিক শর্ত অর্থাৎ খাদ্য প্রাপ্যতার ক্ষেত্রেই কৃষি খানা চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়।

চুক্তিবদ্ধ চাষের নেতিবাচক অভিঘাতে যে সকল খানা কৃষি কাজ ছেড়ে দিয়ে অ-কৃষি খানায় রূপান্তরিত হয়েছে, তাদের খাদ্য নিরাপত্তা বাজার নির্ভর হয়ে পড়েছে।

৩.৯ চুক্তিবদ্ধ চাষের ফলে কৃষিতে নারীর কর্ম-সংকোচন

বর্তমান গবেষণায় অন্ততপক্ষে ১০টি কৃষিজ কর্মকাণ্ডকে চিহ্নিত করা হয়েছে (যথা- বীজ বপণ, আগাছা পরিষ্কার, সার প্রয়োগ, ফসল তোলা বা কাটা, শস্য মাড়াই. ফসল অথবা উপজাত শুকানো, ফসল বাড়িতে নিয়ে যাওয়া, ফসল সংরক্ষণ, বীজ সংরক্ষণ এবং শস্য

[১৩] ২০০৩ থেকে ২০১৩ সালে, ১ দশকে প্রতিদিন গড়ে দেশের গ্রামাঞ্চলের ৬৬১ একর কৃষি জমি অকৃষি খাতে চলে যায় (বারকাত, সোহ্‌রাওয়ার্দী এবং ওসমান, ২০১৫)।

বিক্রি) যেখানে চুক্তিবদ্ধ চাষের ফলে কৃষিকাজে নারীর ভূমিকা সংকুচিত হয়ে এসেছে; কাজের সংকোচনের মাত্রা ০.৫ শতাংশ (সার প্রয়োগ) থেকে ৫৫.৮ শতাংশ (ফসল সংরক্ষণ)।

নিচের সারণি ১৫ থেকে যেমনটা জানা যায়, নারীরা অতীতে বীজ সংরক্ষণে (৫৮.২%) ও শস্য সংরক্ষণে (৬৪.৪%) ব্যাপকভাবে যুক্ত ছিলেন, যা চুক্তিবদ্ধ চাষপদ্ধতিতে যুক্ত হওয়ার পর প্রবলভাবে হ্রাস পেয়েছে (যথাক্রমে ৪.৭% এবং ৮.৮%)। ৭২.৮ শতাংশ নারী শস্য অথবা উপজাত শুকানোর সাথে যুক্ত ছিলেন, এই ধরনের চাষে যুক্ত হওয়ার পর যার হার ৪৮.৮ শতাংশে নেমে এসেছে। এইসব উপাত্ত থেকে এটা বলা যায়, চুক্তিবদ্ধ চাষের প্রতিষ্ঠিত চর্চায় একটি জেন্ডার পক্ষপাত-দুষ্টতা রয়েছে।

সারণি ১৫: চুক্তিবদ্ধ চাষের প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ফসল উৎপাদনে খানার নারীদের অংশগ্রহণ [একাধিক উত্তর]

কাজসমূহ	নারীর অংশগ্রহণ (%)	
	চুক্তিবদ্ধ চাষে অংশগ্রহণের আগে	চুক্তিবদ্ধ চাষে জড়িত থাকার পরে
বীজ বপণে	৬.২	৪.৮
আগাছা পরিষ্কারে	১৫.৬	১৪.৯
সার প্রয়োগে	২.৩	১.৮
কীটনাশক প্রয়োগে	০.০	০.০
ফসল তোলায় বা কাটায়	১১.৮	৬.৪
শস্য মাড়াই	৪০.২	১৮.৩
শুকানো (ফসল অথবা উপজাত)	৭২.৮	৪৮.৮
ফসল বাড়িতে নিয়ে যেতে	১৭.০	৮.১
ফসল সংরক্ষণে	৬৪.৬	৮.৮
বীজ সংরক্ষণে	৫৮.২	৪.৭
শস্য বিক্রিতে	৪.৫	০.৩

অধ্যায় 4

সার-সংক্ষেপ, সুপারিশমালা ও উপসংহার

৪.১ সার-সংক্ষেপ

পত্তনি চাষ ও চুক্তিবদ্ধ চাষ উভয়েই বাংলাদেশের গ্রামীণ কৃষির রূপ ও মর্ম বদলে দিচ্ছে। এই গ্রন্থের আওতাধীন গবেষণায়, আমরা এই বদলের মূল্যায়ন করতে চেয়েছি, এবং এই দুই ধরনের উৎপাদন চর্চায় যেসব সীমাবদ্ধতা রয়েছে, তা বের করতে চেয়েছি।

- পত্তনি চাষ ও চুক্তিবদ্ধ চাষের আওতায় জমি লিজ দেয়া-নেয়া গ্রামীণ কৃষির ক্রমবর্ধমান এক বাস্তবতায় পরিণত হয়েছে। পত্তনি চাষে কৃষকের অংশগ্রহণের মূল কারণ ভূমিহীনতা; আর এক্ষেত্রে ভূমি মালিকের মূল উদ্দেশ্য থাকে স্বচ্ছন্দে অর্থোপার্জন। চুক্তিবদ্ধ চাষের ক্ষেত্রে কৃষকের অংশগ্রহণের মূল কারণগুলো হলো: উপকরণ প্রাপ্তি ও বিক্রির নিশ্চয়তা; আর এই ক্ষেত্রে চুক্তিবদ্ধ কোম্পানির মূল উদ্দেশ্য থাকে সাশ্রয়ী, নিশ্চিত পণ্য প্রাপ্তির সুবিধা ভোগ।
- পত্তনি চাষের জন্য, সমগ্র কৃষি জমির ১.৪ শতাংশ অনুর্বর হয়ে গেছে, চুক্তিবদ্ধ চাষের ক্ষেত্রে এই হার ০.৭৩ শতাংশ। এই দুই চাষ পদ্ধতির ফলে সৃষ্ট অনুর্বর কৃষি জমি, বিক্রির মাধ্যমে হাতবদল হয়ে অ-কৃষি জমিতে পরিণত হচ্ছে।
- পত্তনি আর চুক্তিবদ্ধ চাষ খানাগুলোকে খাদ্যের জন্য বাজারনির্ভর করে তোলার মাধ্যমে তাদের খাদ্য নিরাপত্তাকে ঝুঁকির মুখে ফেলেছে।
- ৭১.১ শতাংশ গ্রামীণ কৃষি খানা - পত্তনি আর চুক্তিবদ্ধ উভয় প্রকার চাষের ক্ষেত্রে - ইতোমধ্যেই ভূমির অনুর্বরতা, ঋণগ্রস্ততা এবং আর্থিক ক্ষয়ক্ষতির কারণে ভুগছে, অনেক কৃষক কৃষিকাজ ছেড়ে দিয়েছে।
- পত্তনি আর চুক্তিবদ্ধ উভয় চাষ পদ্ধতিই কিছু নির্দিষ্ট কৃষি কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ সংকুচিত করছে।
- এক-তৃতীয়াংশ পত্তনি চাষি খানা এবং অর্ধেকের বেশি চুক্তিবদ্ধ চাষি খানা মনে করেন এধরনের চাষের ফলে তারা ইতোমধ্যেই ভূমিসহ কৃষি উৎপাদনের উপর অধিকার হারিয়েছেন।

৪.২ সুপারিশমালা

কৃষির ওপর দরিদ্র ও প্রান্তিক পত্তনি চাষিদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা ও অধিকার রক্ষায় নিম্নোক্ত নীতি ও কর্মসূচীগত সুপারিশমালা বিবেচনায় নেয়া যেতে পারে।

১. জমি পত্তনির ক্ষেত্রে ভূমিহীন, দরিদ্র এবং প্রান্তিক কৃষি খানার অগ্রাধিকার নিশ্চিত করতে হবে; এজন্য নীতি সমর্থনের পাশাপাশি সরকারকে ঐসব খানার জন্য সহজ শর্তে ঋণসহ অন্যান্য উপকরণ সহায়তার ব্যবস্থা করতে হবে।

২. জমির মালিক ও পত্তনি-গ্রহীতার মাঝে লিখিত চুক্তি থাকতে হবে। একজন নির্বাচিত স্থানীয় জনপ্রতিনিধি চুক্তিতে সাক্ষী হিসেবে থাকবে। এরকম একটি লিখিত চুক্তির উপস্থিতি উভয় পক্ষের পত্তনি শর্ত ভঙ্গের প্রবণতা রোধে সহায়ক হবে।

৩. পত্তনির মেয়াদ কমপক্ষে ৫ বছর হওয়া উচিত; প্রয়োজনে নির্দিষ্ট সময় অন্তর চুক্তির শর্তাবলী অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে পর্যালোচনার পর সংশোধিত হতে পারে।

৪. নির্দিষ্ট সময় অন্তর পত্তনি খাজনার হারের উর্ধ্ব সীমা নির্দিষ্ট করে দেয়া উচিত। এতে কৃষকদের স্বাধীনতা বাড়বে।

৫. ফসল কাটার পর অর্ধেক বা অর্ধেকের বেশি পত্তনি খাজনা পরিশোধের বিধান চুক্তিতে থাকা উচিত।

৬. প্রাকৃতিক দূর্যোগ বা অন্য কোনো যুক্তিসংগত কারণে যদি কোনো মৌসুমে শস্যহানির ঘটনা ঘটে, তাহলে পরবর্তী বছরে বিনা খাজনায় জমি চাষের সুযোগ কৃষককে দিতে হবে, যা কৃষকের জীবন-ভঙ্গুরতা কমাতে সহায়ক হবে।

৭. জমির উর্বরতা রক্ষায় পত্তনি চাষি যেন সচেতন হয় এবং সেই অনুযায়ী উদ্যোগ নেয়, সেই লক্ষ্যে সরকারকে ঋণ ও প্রশিক্ষণ সহায়তার ব্যবস্থা করতে হবে।

৮. খানার খাদ্য নিরাপত্তা যেন বাজার নির্ভর না হয়ে পড়ে সেজন্য খানার শস্য চাষের বহুমুখীনতা নিশ্চিত করতে হবে; এজন্য খানাগুলোকে ঋণ, উপকরণ ও প্রশিক্ষণ সহায়তা দিতে হবে।

৯. দরিদ্র ও প্রান্তিক পত্তনি চাষিদের অধিকার সংরক্ষণে উপজেলা কৃষি আদালত প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

কৃষির বাণিজ্যিকীকরণের যুগে যেহেতু চুক্তিবদ্ধ চাষকে অপরিহার্য মনে হয়, সেহেতু 'কৃষকবান্ধব চুক্তিবদ্ধ চাষ নীতি' সময়ের দাবি। কৃষির ওপর দরিদ্র ও প্রান্তিক চুক্তিবদ্ধ চাষীদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা ও অধিকার রক্ষায় নিম্নোক্ত নীতি ও কর্মসূচীগত সুপারিশমালা বিবেচনায় নেয়া যেতে পারে।

১. শত ভাগ ক্ষেত্রেই চুক্তিবদ্ধ চাষিদের লিখিত চুক্তি থাকতে হবে।

২. চুক্তির প্রতিটি শর্ত বুঝে যেন কৃষকরা চুক্তিবদ্ধ হয়, সেজন্য তাদের সচেতনতা ও সক্ষমতা বাড়াতে হবে।

৩. চুক্তি দীর্ঘমেয়াদি হতে পারবে না; চুক্তির শর্তাবলী বার্ষিক বা দ্বি-বার্ষিক মেয়াদে চুক্তিবদ্ধ চাষিদের সাথে অংশগ্রহণমূলকভাবে পর্যালোচনার সুযোগ থাকতে হবে।

৪. উৎপাদন প্রক্রিয়ার ওপর কৃষকের অধিকার ও নিয়ন্ত্রণের বিষয়াবলী চুক্তির শর্তে প্রতিফলিত হতে হবে।

৫. অতিরিক্ত দামে চুক্তিবদ্ধ চাষি কৃষি উপকরণ কিনতে বাধ্য হচ্ছে কিনা তা নিবিড় পরিবীক্ষণের আওতায় আনতে হবে।

৬. মাণ নিয়ন্ত্রণের অজুহাতে কৃষকের পণ্য যেন কোম্পানি যথেচ্ছভাবে ফেরত দিতে না পারে সেই ব্যবস্থা থাকতে হবে।

৭. কৃষকের প্রাপ্য মোট মূল্য থেকে বিভিন্ন কর্তন রোধের জন্য মূল্য প্রদান ব্যবস্থার অস্বচ্ছতা দূরীকরণ জরুরি — এজন্য সরকারি নজরদারির ব্যবস্থা থাকতে হবে।

৮. নিজেদের দর কষাকষি ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ক্ষুদ্র, দরিদ্র ও প্রান্তিক চাষিরা যাতে দলবদ্ধভাবে চুক্তিতে অংশগ্রহণ করতে পারে সেই ব্যবস্থা করতে হবে।

৯. চাষ প্রক্রিয়ায় নারীর কর্মসংকোচন প্রতিস্থাপনের সুযোগ থাকতে হবে।

১০. কৃষকের জন্য চুক্তিবদ্ধ চাষ যেন একটি 'চয়ন' হিসেবে আসে, 'দৈবাৎ' বা 'চাপিয়ে দেয়া বোঝা' হিসেবে নয়।

১১. চুক্তিভঙ্গ রোধ, চুক্তিতে দরিদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের অধিকার সংরক্ষণের জন্য উপজেলা কৃষি আদালত গঠন করা জরুরি।

জমি অনুর্বর করে, সেই অনুর্বর জমি অ-কৃষি কাজে ব্যবহারের সুযোগ করে দিয়ে, পত্তনি চাষ ও চুক্তিবদ্ধ চাষ উভয়েই কৃষি জমির অ-কৃষি জমিতে রূপান্তরের ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখছে। এই বিষয়টি কৃষি জমি সুরক্ষা আইনে বিশেষ দৃষ্টি দিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া উচিত।

৪.৩ উপসংহার

পত্তনি চাষ বা ঠিকা প্রথায় চাষ (Fixed rent leasing) হলো প্রধানত নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে জমির মালিক চাষিকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য (১ বছর বা ১ মৌসুম) তার জমি চাষ করার সুযোগ দেয়। বিশুদ্ধ পত্তনি চাষ প্রথাটি এদেশে তুলনামূলক নতুন (অতীতে তা বর্গাচাষের সাথে সহবস্থান করতো)। পত্তনিতে যারা জমি দিচ্ছেন তারা প্রধানত ভূমি-উদ্বৃত্ত বড় ও মাঝারি ভূমি-মালিক খানা যারা এখন মূলত চাষাবাদ-বহির্ভূত ব্যবসা-বাণিজ্য-চাকুরিসহ শহর-মুখী। আর যারা তাদের জমি-জমা পত্তনি নিচ্ছেন, জনসংখ্যাধিক্যের এই দেশে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা প্রান্তিক ও ভূমিহীন খানা যাদের সামনে চাষবাসের তেমন কোন বিকল্প নেই। পত্তনি দাতাদের তাদের জমির বিভাজিত ফসলে (অর্থাৎ ফসল খাজনা) কোনোই আগ্রহ নেই, তাদের স্বাভাবিক আকর্ষণ নগদ টাকা। আর এ নগদ টাকা তারা শহরে ভোগ করে, আর বিনিয়োগ করলেও সেটা শহরেই করে। আবার প্রধানত তুলনামূলক ভূমিহীন-প্রান্তিক কৃষকদের সংখ্যাধিক্যের কারণে পত্তনি খাজনার হারও ক্রমবর্ধমান। একই সাথে ভূমিহীন-প্রান্তিক কৃষকদের জন্য প্রতিকূল এ পরিবেশে জমি-জমার পত্তনি প্রাপ্তিতে কোনো লিখিত চুক্তিরও প্রয়োজন পড়ে না। অর্থাৎ পত্তনি দাতা – বড় ও মাঝারি ভূমি-মালিক – কৃষি থেকে প্রাপ্ত নগদ অর্থ কৃষির সম্প্রসারিত পুনরূৎপাদনে (Extended reproduction) বিনিয়োগ করছে না (করার প্রয়োজনও পড়ছে না); একই সাথে নগদ অর্থে পত্তনি খাজনার হারও ক্রমবর্ধমান এবং লিখিত চুক্তির অনুপস্থিতিতে পত্তনি চাষিও পূর্ণ নিরাপত্তাহীন। এসবই নির্দেশ করে যে

আমাদের দেশের কৃষিতে চলমান পত্তনি চাষ চিরায়ত পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্কের পরিচায়ক নয় – হতে পারে তা আধা পুঁজিবাদী কোন উৎপাদন সম্পর্কের পরিচায়ক অথবা কোন ধরনের উত্তরণকালীন (Transitional) উৎপাদন সম্পর্কের পরিচায়ক, যে উত্তরণের শেষ কোথায় ও কবে তা বলা মুশকিল এবং শর্তসাপেক্ষ। সামগ্রিক অর্থনীতির বিকাশ স্তরে যে শর্তে এবং যে পরিপ্রেক্ষিতে পত্তনি চাষ চলছে তার অর্থনৈতিক-সামাজিক-প্রাকৃতিক অভিঘাত সন্দেহাতীতভাবে নেতিবাচক: পত্তনি চাষের কারণে কৃষির ওপর প্রকৃত কৃষকের অধিকার, স্বাতন্ত্র এবং নিয়ন্ত্রণ হ্রাস পাচ্ছে; অধিক ফলনের আশায় মাত্রাতিরিক্ত রাসায়নিক উপাদান ব্যবহারের ফলে কৃষি জমির প্রাকৃতিক উর্বরতা হ্রাস পাচ্ছে; প্রকৃত কৃষক কৃষি কাজ ত্যাগ করে বিকল্প কর্মসংস্থানের পথ খুঁজছে; জমি অনুর্বর হচ্ছে এবং অনুর্বর জমি বিক্রির আগ্রহ বাড়ছে; কৃষি খানার খাদ্য নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে; কৃষিতে নারীর কর্ম-সংকোচন বৃদ্ধি পাচ্ছে; পত্তনি জমির মালিক কৃষির সম্প্রসারিত পুনরূৎপাদনে আগ্রহ হারিয়ে ফেলছে। আর *চুক্তিবদ্ধ চাষের* (Contract farming) ক্ষেত্রে অভিঘাতে-এর মর্মার্থও পত্তনি চাষ-এর মতই। ব্যতিক্রম শুধু কয়েকটি ক্ষেত্র, যেমন – নিজস্ব কৃষি জমিতে চুক্তিবদ্ধ চাষের আধিক্য, উৎপাদিত কৃষি পণ্যের বাজারজাতকরণ সুবিধা-অসুবিধা ইত্যাদি। তবে উৎপাদন সম্পর্কের নিরিখে আমাদের দেশের পত্তনি চাষ ও চুক্তিবদ্ধ চাষ উভয়ই পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্ক বিকাশের বিভিন্ন মাত্রার পরিচায়ক অথবা হতে পারে পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্ক গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে এক ধরনের উত্তরণকাল। পুঁজিবাদী এ সম্পর্কের মাত্রা-স্তর, পদ্ধতি ও সংশ্লিষ্ট প্রভাব-অভিঘাত নিয়ে গবেষণা জরুরি।

পত্তনি চাষ এবং চুক্তিবদ্ধ চাষ সময়ের বিবর্তনে, বাজারের স্বাভাবিক মিথস্ক্রিয়ায় চাষ পদ্ধতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। নিকট ভবিষ্যতে এদের বিলয়ের কোনো সম্ভাবনা নেই, বরং এ দু'য়ের আরো প্রসার ঘটবে। সেক্ষেত্রে সরকারের নীতি ও কর্মসূচীর লক্ষ্য হওয়া উচিত এ দুই চাষ-চর্চার নেতিবাচক পরিণামের সর্বনিম্নকরণ ও ইতিবাচক পরিণামের সর্বোচ্চকরণের মাধ্যমে প্রান্তিক ও দরিদ্র কৃষকের চলমান অ-ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়ার যবনিকা টানা। শেষ পর্যন্ত তা সম্ভব হবে কিনা সেটি একবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কৃষি প্রশ্ন।

তত্ত্ব ও তথ্য উৎস

আখতার, ফ. (২০১৮). *বাণিজ্যিক কৃষি: করপোরেট চরিত্র ও বহুজাতিক দখলদারি*। ঢাকা: বণিক বার্তা (বিশেষ সংখ্যা / উন্নয়ন অমনিবাস ৪), ৩০ সেপ্টেম্বর।

ইউসুফ, আ. (২০১১) বাংলাদেশের কৃষি ধনতান্ত্রিক না আধাসামন্ততান্ত্রিক? ঢাকা: সমাবেশ।

বারকাত, আ. (২০১৯). *উৎপাদন পদ্ধতি: তত্ত্ব, এশিয়াটিক, ইতিহাস রচনায় প্রাসঙ্গিকতা, প্রাক্-পুঁজিবাদী চীন, আমেরিকা, বাংলাদেশ*। ঢাকা: মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা।

বারকাত, আ. (২০১৬). *বাংলাদেশে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের রাজনৈতিক অর্থনীতি*। ঢাকা: মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা।

বিবিএস (২০১৭). খানা আয় ব্যয় জরিপ ২০১৬ প্রাথমিক প্রতিবেদন। ঢাকা: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

মৃধা, সা. (২০১৯). *কেঁচো সার উৎপাদনে নারীরা*। ঢাকা: প্রথম আলো, ২৬ জানুয়ারি।

রুদ্র, অ. (১৯৮৫). *ভারতবর্ষের কৃষি অর্থনীতি*। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স।

শাহীন, সা. (২০১৮). *ফল আবাদে শীর্ষে কলা*। ঢাকা: বণিক বার্তা (বদ্বীপ), ৩ এপ্রিল।

হোসেন, মা. এবং বায়েস, আ. (২০১৫). *বিশ গেরামের গল্প*। ঢাকা: দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড।

Adam, A. (2013). *Dollarization in a Small Open Economy – The Case of Maldives.* World Review of Business Research (Vol. 3, No. 3).

Adams, D.W. & D.H. Graham (1984). A Critique of Traditional Agricultural Credit Projects and Policies. In C.K. Eicher and J.M. Staatz. *Agricultural Development in the Third World*. John Hopkins University Press, Baltimore: 313-328.

Barkat, A. & Suhrawardy, G.M. (2019). *Empowering the Poor and Marginalized through Land Reform: CSO Land Watch Monitoring Report in Bangladesh: 2018.* In ANGOC (Ed.), State of Land Rights and Land Governance in Eight Asian Countries: Forty Years after the World Conference on Agrarian Reform and Rural Development. Quezon City: ANGOC.

Barkat, A., Suhrawardy, G.M., Osman, A., Rahman, M. & Ahamed, F.M. (2018). *Mid-term Impact Assessment of Nuton Jibon Livelihood Improvement Project (NJLIP)*. Dhaka: HDRC & SDF.

Barkat, A., & Suhrawardy, G.M. (2018). *Present Form and Disempowerment Process of the Rural Peasants: A Case Study on Two Northern Upazilas*. Dhaka: HDRC & Nijera Kori.

Barkat, A., Suhrawardy, G.M., Osman, A. & Barkat, A. (2017). *Rural Land Market in Bangladesh An Exploratory Study with the Poor and Marginalized People.* Dhaka: Manusher Jonno Foundation.

Barkat, A., Suhrawardy, G.M., & Osman, A. (2015). *Increasing Commercialization of Agricultural Land and Contract Farming in Bangladesh.* Dhaka: HDRC & ALRD.

Barkat, A., Suhrawardy, G.M. & Ghosh, P.S. (2011). *Commercialization of Agricultural Land and Water bodies and Disempowerment of the Poor in Bangladesh: An Exploratory Study*. Dhaka: HDRC & ALRD.

Barkat, A. et al. (2008). *Contract Farming in Bangladesh: Political Economy of Tobacco Cultivation and Processing.* Dhaka: HDRC & Nijera Kori,

Barkat, A. & Akhter, S. (2001). *A Mushrooming Population: The Threat of Slumization Instead of Urbanization in Bangladesh*, Harvard Asia Pacific Review. 5(1). Pp. 27-30.

Cheung, S.N.S (1969). *The Theory of Share Tenancy*, Chicago.

Bidisha, S.H., Khan, A., Imran, K., Khondker, B.H. & Suhrawardy, G.M. (2017) *Role of Credit in Food Security and Dietary Diversity of Bangladesh*. Economic Analysis and Policy.53C pp. 33-45.

Da Silva, C. A. (2005).*The Growing Role of Contract Farming in Agri-Food Systems Development: Drivers, Theory, and Practice*. Rome: FAO.

Griffin, K (1974). *The Political Economy of Agrarian Change: An Essay on the Green Revolution*, Cambridge: Harvard University Press.

Key, N. and Runsten, D. (1999). *Contract Farming, Smallholders, and Rural Development in Latin America: the Organization of Agroprocessing Firms and the Scale of out grower Production*. *World Development*, 27(2) pp. 381-401.

Kirsten, J. & Sartorius, K.I. (2002). *Linking Agribusiness and Small Farmers in Developing Countries: Is There a New Role for Contract Farming?* Development Southern Africa 19(4) October 2002.

Marshall, A. (1890). *Principles of Economics: An Introductory Volume.* 8th edition. [Online] London: Macmillan and co., limited. Available from: http://oll.libertyfund.org/title/1676. [Accessed: 28th January 2016]

Minot, N. (1986). *Contract Farming and its Effect on Small Farmers in Less Developed Countries*. Working Paper No. 31. Department of Agricultural Economics, Michigan State University.

Rahman, R. I. (2012). *Bangladesher Orthoniti o Unnoyon: Shadhinotar Por 40 Bochor (*Economics and Development of Bangladesh: 40 Years after Independence*),* Dhaka: Shahittya Prakash.

Rao, C.H.H. (1975). *Technological Change and Distribution of Gains in Indian Agriculture*, Delhi: Institute of Economic Growth.

Ricardo, D. (1817), *On the Principles of Political Economy and Taxation (1 ed.), London: John Murray*, retrieved 2018-2-07 via Google Books.

Smith, A. (1776). *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations.* [Online]. Available from: http://en.wikisource.org. [Accessed: 28th March 2018]

Stewart, D.W. and Shamdasani, P.N. (1990) *Focus Groups: Theory and Practices*, UK: Sage.

নির্ঘন্ট

অ
অবিমিশ্র আশীর্বাদ
অচিরায়ত পুঁজিবাদ
অধিকার
অ-ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়া

আ
আগাছা পরিষ্কার
আধিপত্যশীল
আধাসামন্ততান্ত্রিক
আবুল বারকাত
আসমার ওসমান

ই
ইউসুফ

উ
উর্বরতা হ্রাস
উৎপাদন সম্পর্ক
উৎপাদন-সিদ্ধান্ত
উৎপাদন প্রক্রিয়া
'উৎপাদন-বর্ধন বিরোধী'
উত্তরণকালীন উৎপাদন সম্পর্ক
উদ্বৃত্ত শ্রম

এ
একুশ শতক
এইচ ডি আর সি

ঋ
ঋণগ্রস্ততা

ক
কর্মসূচী
কর্ম-সংকোচন
কর্পোরেট প্রতিষ্ঠান
কীটনাশক প্রয়োগ
কৃষক বিদ্রোহ
কৃষক-হিতৈষী
কৃষি আদালত
কৃষি প্রশ্ন

খ

খাজনা
খাদ্য নিরাপত্তা
খুশী কবির

গ
গবেষণা
গরিব কৃষক
গাইবান্ধা
গাজী মোহাম্মদ সোহ্‌রাওয়ার্দী

চ
চাষ-চর্চা
চাষ-স্বাধীনতা
চুক্তিবদ্ধ চাষ
চুক্তিবদ্ধ চাষি
চুক্তির শর্ত
চয়ন

জ
জমি
জি আর প্রযুক্তি
জীবন-ভঙ্গুরতা
জীবিকা

দ
দিন মজুর

ধ
ধনতান্ত্রিক

ন
নারী প্রধান খানা
নিজেরা করি
নিয়ন্ত্রণ
নীতি

প
পত্তনি চাষ
পত্তনি চাষি
পার্থ সারথী ঘোষ
পুঁজিবাদী
প্রান্তিক কৃষক
পীরগঞ্জ

ফ

ফসল তোলা বা কাটা
ফসল অথবা উপজাত শুকানো
ফসল বাড়িতে নিয়ে যাওয়া
ফসল সংরক্ষণ

ব
বর্গা চাষ
বাজার নির্ভর
বাণিজ্যিক খামার
বাণিজ্যিকীকরণ
বিশ্বায়ন
বিকৃত পুঁজিবাদ
বীজ বপণ
বীজ সংরক্ষণ

ভ
ভাগ চাষ
ভূমিহীন
ভূমি-দরিদ্র

ম
'মুনাফা-সর্বোচ্চকারী'

র
রংপুর

শ
শস্য আবর্তন
শস্য বিক্রি
শস্য মাড়াই
শোষণমূলক বৈশিষ্ট্য

স
সরবরাহ-শৃঙ্খল শাসনব্যবস্থা
সম্প্রসারিত পুনরুৎপাদন
সম্পত্তি সম্পর্ক
সাঘাটা
সার প্রয়োগ
স্বাতন্ত্র্য

ক্ষ
ক্ষমতা কাঠামো

গবেষণা দল

প্রধান গবেষক

আবুল বারকাত, পিএইচডি

সহ-গবেষক

গাজী মোহাম্মদ সোহ্‌রাওয়ার্দী, এমএসএস
আসমার ওসমান, এমএসএস

গবেষণা সহকারী

মুহাম্মদ ইরফানুর রহমান, বিএসএস
রাহিনুর বিনতে রফিক, এমএস
নাওয়াল সারোয়ার, বিএসসি

মাঠ সমন্বয়কারী

মো. কবিরুজ্জামান

মাঠ গবেষক

সুরাইয়া পারভিন তৃষ্ণা
মিলি খাতুন
রুবিনা আক্তার
রওশন ই সেতারা
সাবরিনা মমতাজ
মোছা: সাবিনা খাতুন
মো. আব্দুল ওয়াহেদ
মো. জিয়া নাসিম
রবিউল ইসলাম
মামুন উর রশীদ

সিস্টেম অ্যানালিস্ট

অজয় কুমার সাহা

আর্থিক ব্যাবস্থাপনা

আবু তালেব

প্রশাসনিক সহযোগিতা

মো. সাবেদ আলী
মো. আরিফ মিয়া

ডেটা এন্ট্রি অপারেটর

সৈয়দ জুন্নুন হাসান